ইজমা, কিয়াস ও ফিক্‌হ শাস্ত্র

ভূমিকা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন ও পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। মহান আল্লাহ মানব জীবন পরিচালনার জন্য মানব প্রকৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক জীবন ব্যবস্থা প্রদান করেছেন। ফিক্‌হ শাস্ত্র বা ইসলামী আইন বিজ্ঞান কালোত্তীর্ণ বিধান। এর সকল বিধি-বিধান কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উৎসারিত। মহানবীর (স) জীবদ্দশায়ই এর মৌল কাঠামো পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। পরবর্তীতে যুগ জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম মনীষীদের গবেষণায় এটা ইলমে ফিক্‌হ বা ফিক্‌হ শাস্ত্র বা "ইসলামী আইন বিজ্ঞান" রূপে রূপায়িত হয়।

ফিক্‌হ হচ্ছে শরীআত সম্পর্কিত জ্ঞান বা আহকামে শরীআত সম্পর্কে ইসতিম্বাত (আবিষ্কার) করার জ্ঞান। ইসলামী শরীআর বিধানাবলি যে শাস্ত্রে আলোচিত হয় তাকে ফিক্‌হ শাস্ত্র বা ইসলামী আইন বিজ্ঞান বলা হয়। আর এ দৃষ্টিতে বিস্তারিত দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে বাস্তব কাজকর্ম বিষয়ে শরীআতের হুকুম-আহকাম যার জানা আছে তাকেই বলা হয় 'ফকীহ'। অর্থাৎ ফিক্‌হ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ও ব্যুৎপত্তি অর্জনকারী আলিমকে 'ফকীহ' বলা হয়।

ফিক্‌হ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ফিকহের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোন দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ নেই। ফিক্‌হের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মহানবী (স) বলেন– "প্রত্যেক বস্তুর কতকগুলো স্তম্ভ আছে। আর ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে আল্‌-ফিক্‌হ।" কুরআন ও হাদীসের আলোকে ফক্বীহগণ বলেন, দৈনন্দিন জীবনে জরুরি মাসআলা শিক্ষা করা ফরযে আইন এবং এর চেয়ে বেশি শিক্ষা করা 'ফরযে কিফায়া'।

ফিক্‌হ শাস্ত্রের প্রধান উৎস হচ্ছে- কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াস। এ ইউনিটে ইজমা ও কিয়াস এবং ফিক্‌হ শাস্ত্রের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হলো-

পাঠ-১ : ইজমা

পাঠ-২ : কিয়াস

পাঠ-৩ : ফিকহ শাস্ত্রের পরিচয় ও এর উৎপত্তি

পাঠ-৪ : ফিক্‌হ শাস্ত্রের সংকলন

পাঠ-৫ : মাযহাবের পরিচয়

পাঠ-৬ : ইমাম আবু হানিফা (র) ও তাঁর মাযহাবের বৈশিষ্ট্য

পাঠ-৭ : ইমাম মালিক (র) ও তাঁর মাযহাব

পাঠ-৮ : ইমাম শাফিঈ (র) ও তাঁর মাযহাব

পাঠ-৯ : ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) ও তাঁর মাযহাব

পাঠ-১০ : ফিকহ শাস্ত্রে ব্যবহৃত কতিপয় পরিভাষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- ইজমা কাকে বলে বলতে পারবেন;
- ইজমা শরীআতের উৎস হওয়ার প্রমাণ দিতে পারবেন।

১.১ ইজমার পরিচয়

ইজমা শব্দটি আরবি শব্দ, যার আভিধানিক অর্থ হলো- ঐকমত্য হওয়া, শক্তিশালী করা, দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেওয়া, একমত হওয়া ইত্যাদি। সুতরাং কোন বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করার নামই হলো ইজমা। "কোন কাজ অথবা কথার উপর এক যুগের উম্মাতে মুহাম্মদীর ন্যায়বান মুজতাহিদগণের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তকে শরীআতের পরিভাষায় 'ইজমা' বলে।" এটি ইসলামী আইনের মূলনীতির অন্যতম ভিত্তি এবং কুরআন-সুন্নাহর পর এর স্থান। ইজমা শরীআতের তৃতীয় উৎস। গুরুত্বের বিচারে কুরআন ও হাদীসের পরই ইজমার স্থান। কোন বিশেষ যুগে আইন সংক্রান্ত কোন বিশেষ প্রশ্নের সমস্যার সমাধান কুরআন ও হাদীসকে কেন্দ্র করে মুসলিম পণ্ডিতগণ যে সম্মিলিত অভিমত পোষণ করেছেন ইসলামী শরীআতে তাই হলো ইজমা। ইজমা রাসূল (স)-এর বাণী দ্বারা বৈধ প্রমাণিত হয়েছে।

১.২ ইজমা শরীআতের উৎস হওয়ার প্রমাণ

ইজমা শরীআতের উৎস হওয়ার পিছনে কুরআন ও হাদীসের যে দলিল রয়েছে তা নিচে আলোচনা করা হলো-
কুরআনে বলা হয়েছে–

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ

"তোমরা হলে উত্তম উম্মাত, তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানব জাতিকে সৎকর্মের আদেশ দেয়ার জন্য।"

কুরআনে আরও বলা হয়েছে– "আর আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মাতরূপে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা মানুষের প্রতি সাক্ষ্যদানকারী হতে পার।" আয়াতে উম্মাতের ন্যায়পরায়ণতাকে মধ্যপন্থী উল্লেখ করেছে, যা কিনা ইজমার একটি পরোক্ষ দলিল।

রাসূল (স) ঘোষণা করেন-

لَا تجتَمِعُ أُمَّتِى عَلَى الضَّلَالَةِ

"আমার উম্মাতগণ কোন ভুল বিষয়ে ঐকমত্য হবে না।"

তিনি আরও বলেন, "মুসলমানগণ যা ভালো মনে করে আল্লাহর নিকটও তা ভাল।"
উপরিউক্ত কুরআন ও হাদীসের বাণী প্রমাণ করে উম্মাতের ইজমা শরীআতের উৎস।

ইজমা যে শরীআতের উৎস তা প্রমাণিত হয় সাহাবাগণের ইজমা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। মহানবী (স)-এর ইন্তিকালের পর মদীনা রাষ্ট্রের ভিত্তি সম্প্রসারিত হলে বিভিন্ন সমাজ ও সভ্যতার সাথে ইসলামের পরিচয় হয়। ফলে সমস্যাও বৃদ্ধি পায়। তখন সাহাবাগণ বাধ্য হয়ে ইজমার আশ্রয় গ্রহণ করেন। আর সাহাবাদের কর্মের উপরে কোন মুসলমান সন্দেহ পোষণ করতে পারে না। সুতরাং ইজমা শরীআতের উৎস।

১.৩ ইজমা উৎপত্তির সময়কাল

ইজমা শরীআতের তৃতীয় উৎস। আর এটা তৃতীয় উৎস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর যুগ থেকেই। ইসলাম কালজয়ী আদর্শ, সময়োপযোগী জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম সকল প্রকার সমস্যার সমাধান পেশ করেছে। রাসূল (স)-এর যুগেও কোন সমস্যার সমাধান কুরআনের মধ্যে না পাওয়া গেলে রাসূল (স) বিশিষ্ট সাহাবাগণের সাথে পরামর্শ করে তার সমাধান দিতেন। আর এ ব্যাপারে কুরআনের নির্দেশ তো আছেই-

وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ

"তাঁদের কাজকর্ম সমাপন হয় তাদের মধ্যকার পরস্পরের পরামর্শের ভিত্তিতে।"

উদাহরণ : রাসূল (স) উহুদ যুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধ এড়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সাহাবাগণের সকলের ইচ্ছায় গুরুত্ব প্রদান করলে রাসূল (স) উহুদে সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

খোলাফায়ে রাশেদার যুগে : খোলাফায়ে রাশেদার আমলে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিসীমা বিস্তৃতি লাভ করলে নানা জাতি গোষ্ঠীর সাথে ইসলামের পরিচয় ঘটে। ফলে নানা সমস্যারও উদ্ভব হয়। তখন উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের জন্য ইসলামী চিন্তাবিদগণ ঐকমত্য পোষণ করে ঐ সমস্যার সঠিক সমাধান বের করেন। হযরত ওমর (রা) নানা বিষয়ে ইজমার মাধ্যমে সমাধান দিয়েছেন। খোলাফায়ে রাশেদার অন্যান্য রাষ্ট্র প্রধানগণও ইজমার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান দিতেন। সাহাবীদের জীবনে বহু ইজমা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ঘটনা ঘটে। তাঁরাও যে সকল বিষয়ে কুরআন ও হাদীস দ্বারা সমাধান দিতে পারেননি, সেসব বিষয়ে ইজমা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

উদাহরণ : হযরত ওমর (রা)-এর আমলে রমযান মাসের বিশ রাকআত তারাবীর নামায জামাতের সাথে আদায় জনিত সমস্যার সমাধানটি উল্লেখ করা যেতে পারে।

তাবিঈগণও কোন সমস্যার সমাধানে সরাসরি কুরআন ও হাদীসের সাহায্য পেতে ব্যর্থ হলে কুরআন ও হাদীসের সাহায্য নিয়ে ইজমা করতেন।

বর্তমান যুগে ইজমা : বর্তমান যুগেও ইজমা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এ ব্যাপারে সকল আলিম একমত পোষণ করেছেন।

উদাহরণ : পবিত্র নগরী জেরুজালেমকে ইয়াহুদীদের হাত থেকে উদ্ধার করতে মুসলমানগণ ইজমার মাধ্যমে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

১.৪ ইজমার প্রয়োজনীয়তা

মানব সমাজ গতিশীল। মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে মুসলিম সমাজ এমন কতকগুলো নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয় যার সমাধানের সুস্পষ্ট নির্দেশনা কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যায়নি। অথচ কুরআনে আল্লাহ মানুষের জন্য সব কিছু বর্ণনা করেছেন বলে আল্লাহর ঘোষণা–

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ

"আমি কুরআনে কোন কিছু বাদ রাখিনি।" (সূরা আনআম : ৩৮)

মানব জ্ঞান সসীম। তাদের সীমিত জ্ঞান-গবেষণায় কুরআন থেকে যাবতীয় সমস্যার সমাধান আহরণ করতে সক্ষম হয় না। সুতরাং সাবাহীদের যুগ হতেই কুরআন-হাদীস থেকে না পাওয়া বিষয় ইজমার মাধ্যমে সমাধান করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ থেকে ইজমার উৎপত্তি।

১.৫ ইজমার গুরুত্ব

কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে পরোক্ষভাবে ইজমার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন-

"যারা সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পর নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করেছে, তাদের মত হয়ো না।" (আল-কুরআন)

মহান আল্লাহ আরো বলেন : "তুমি যদি নিজে না জান, তবে যে জানে তাকে জিজ্ঞেস কর।" (সূরা আল নাহল)

মহানবী (স) বলেন : "মুসলমানগণ যা ভাল বলে মনে করেন, তা আল্লাহর নিকটও ভাল।"

তিনি আরো বলেন–"আমার উম্মতগণ কোন ভুল বিষয়ে একমত হবে না।" রাসূল (স) আরো বলেন– "তোমাদের সামনে মীমাংসার জন্য কোন সমস্যা উপনীত হলে কিতাবুল্লাহ অনুসারে ফয়সালা করবে, আল্লাহর কিতাবে নেই এমন কিছু আসলেই সুন্নাহর দিকে দৃষ্টিপাত করবে। সুন্নাতে নেই এমন কোন বিষয়ের উদ্ভব হলে মুসলিম উম্মাহর মতৈক্যের তথা ইজমার উপর নির্ভর করবে।"

সকল সুন্নী মায্হাব ইজমাকে আইনের উৎস হিসেবে ইজমার বুনিয়াদ কুরআন-হাদীসের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে থাকেন। সুতরাং কুরআন-হাদীসে নেই এমন কোন বিষয়ে উম্মাহর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হলে তা মেনে চলা প্রত্যেকের কর্তব্য।

১.৬ ইজমার পদ্ধতি

ইজমা তিনটি উপায়ে বা পদ্ধতিতে সংগঠিত হয়। (ক) কাউল বা মৌখিক উক্তি দ্বারা। অর্থাৎ যখন মুজতাহিদগণ কোন বিশেষ বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কে প্রকাশ্য মতামত প্রকাশ করেন। (ক) ফেল বা কর্ম দ্বারা। অর্থাৎ কার্যক্ষেত্রে যখন সকলে একই পন্থা অবলম্বন করে কাজ করে। এতেও ইজমা সংগঠিত হয়। (গ) সুকূত বা মৌন সম্মতি। অর্থাৎ মুজতাহিদগণ যখন এক বা একাধিক ব্যক্তির প্রকাশিত মতের সঙ্গে মতৈক্য প্রকাশ করেন তখন ইজমা সংগঠিত হয়।

১.৭ ইজমার প্রকারভেদ

ইজমা দুই প্রকার। যথা- (ক) ইজমা-আযীমাত ও (খ) ইজমা-রুখসাত।

ইজমা-আযীমাত : যখন কোন যুগের সকল মুজতাহিদ কোন বিশেষ বিষয় সম্পর্কে তাদের সর্বসম্মতভাবে মত প্রকাশ করেন, তখন তাকে ইজমা-আযীমাত বলা হয়। অর্থাৎ মুজতাহিদদের এ বলে সংকল্প হওয়া যে, আমরা এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করলাম, অথবা কোন কার্য সম্পর্কিত বিষয় হলে সকলে সে কাজে আত্মনিয়োগ করা।

ইজমা-রুখসাত : যখন কোন বিষয় সম্পর্কে সকল মুজতাহিদ একমত হন না, কিন্তু কোন মুজতাহিদদের ফায়সালা সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজ কর্তৃক গৃহীত হয়, তখন তাকে বলা হয় ইজমা-রুখসাত। রুখসাত অর্থ অবকাশ। কোন বিষয়ে অধিকাংশ মুজতাহিদ ঐকমত্য পোষণ করলে বাকিরা এ বিষয়ে তিন দিন পর্যন্ত যদি নীরবতা পালন করেন। তাহলে তাদের এ নীরবতা সমর্থনের লক্ষণ।

১.৮ ইজমার হুকুম

ইসলামী শরীআত সংক্রান্ত বিষয়ে ইজমা দ্বারা অকাট্য দলিল সাব্যস্ত হয়। তাই কোন ক্রমেই ইজমার বিরোধিতা করা যায় না। ইজমার দ্বারা প্রবর্তিত বিধি-বিধান বিনা দ্বিধায় পালন করা কর্তব্য।

১.৯ ইজমার কার্যকারিতা

ইজমার কার্যকারিতা সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। কোন কোন সুন্নী ফকীহ আলেমদের মতে, একমাত্র নবী করীম (স)-এর সাহাবীদের মধ্যে ইজমা সীমাবদ্ধ। তাঁরা পরবর্তী কালের ইজমা গ্রহণ করতে রাজি নন। সর্বদা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সাহচর্য লাভ করায় তাঁরা তাঁকে বেশি করে জানবার ও বুঝবার সুযোগ পেয়েছিলেন। এজন্য সাহাবীদের মতামতের মূল্য দেওয়া উচিত।

আবার কেউ কেউ ইজমার সময়সীমা নবী করীম (স)-এর সাহাবীদের সঙ্গী অর্থাৎ তাবিঈনের যুগ পর্যন্ত বাড়িয়েছেন। ইমাম মালিক (র) একমাত্র মদীনার লোকের সম্মতির ওপর তাঁর ইজমা প্রয়োগ করতেন। তিনি মত প্রকাশ করেছেন যে, শুধু মদীনার লোকেরাই সর্বসম্মতিক্রমে ইজমা প্রয়োগ করতে পারেন। কিন্তু তাঁর এ মতের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে এ কারণে যে, আলেম ও শিক্ষিত লোক শুধু মদীনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আধুনিক ব্যবহার শাস্ত্রবিদদের (ফকীহদের) মতে, ইজমা কোন বিশেষ যুগের বা বিশেষ সময়ের লোকদের বা বিশেষ দেশের মতৈক্যের ওপর গড়ে ওঠেনি। এটি হচ্ছে, যে কোন যুগে যে কোন দেশের অধিকাংশ ফিকহ শাস্ত্রবিদদের মতৈক্যের ফল।

শিয়াদের মতে, ইজমার অধিকার কেবল হযরত আলী (রা) ও তাঁর বংশধরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু সুন্নীদের মতে, যে কোন স্থানের এবং যে কোন যামানার মুসলিম মুজতাহিদদের ঐকমত্যই ইজমা।

সারকথা

ফিকহ্ শাস্ত্রের চারটি মূল উৎসের মধ্যে ইজমা গুরুত্বপূর্ণ উৎস। চার মাযহাবের ইমামগণ ইজমাকে সাদরে গ্রহণ করেছেন। ইজমা ব্যতীত শরীআতই অপূর্ণ থেকে যায়। সুতরাং ইজমার গুরুত্ব অত্যধিক। ইজমায় বিশ্বাস করা

অত্যাবশ্যক। যেহেতু এটি কুরআন ও সুন্নাহর ওপরে গবেষণালব্ধ জ্ঞানের ফসল তাই ইজমা মেনে চলা ও বিশ্বাস করা অপরিহার্য।

পৃথিবীর সব কিছুই পরিবর্তনশীল। চলমান পৃথিবীর সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে যুগ জিজ্ঞাসার সঠিক ও যথার্থ সমাধান পেশকরণে ইজমার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। নতুবা ইসলামী আইনশাস্ত্রে স্থবিরতা ও সঙ্কটের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

এক কথায় উত্তর দিন-

১. ইসলামী শরীআতের তৃতীয় উৎস কী?

২. গুরুত্বের বিচারে ইজমার স্থান কোথায়?

৩. ইজমার আভিধানিক অর্থ লিখুন।

৪. ইজমার উৎপত্তির সময়কাল কখন?

৫. তারাবীর নামায জামাআতের সাথে আদায়ের বিধান কিসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত?

৬. বর্তমান যুগে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে কি?

৭. ইজমা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কয়টি পদ্ধতি?

৮. ইজমা কত প্রকার?

৯. ইজমা-আযীমাত অর্থ কী?

১০. ইজমা-রুখসাত মানে কি?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইজমার আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা লিখুন।

২. "ইজমা শরীআতের উৎস" প্রমাণ করুন।

৩. ইজমার উৎপত্তির সময়কাল নিরূপণ করুন।

৪. ইজমার পদ্ধতি লিখুন।

৫. ইজমার প্রকারভেদ বর্ণনা করুন।

৬. শরীআতে ইজমার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

কিয়াস القياس

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- কিয়াস-এর পরিচয় দিতে পারবেন;
- কিয়াস-এর প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে পারবেন;
- কিয়াস-এর উৎপত্তির বর্ণনা দিতে পারবেন;
- কিয়াস-এর নীতিমালার বিবরণ দিতে পারবেন।

২.১ কিয়াসের পরিচয়

কিয়াস আরবি শব্দ। যার আভিধানিক অর্থ হলো - পরিমাপ করা, অনুমান করা, তুলনা করা ইত্যাদি। অর্থাৎ- শাব্দিকভাবে কিয়াস হলো কোন বস্তুকে অন্য বস্তুর সাথে তুলনা করা।

কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে শরীআতের যেসব হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়, শাখা-প্রশাখার মধ্যে যদি ঐ হুকুম এর কারণ সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায়, তবে শাখায় মূলের অনুরূপ হুকুম প্রদান করাকে শরীয়াতের ভাষায় কিয়াস বলা হয়।

ইমাম মালিক (র) বলেন, "মূল আইন হতে ইল্লাত বা সূত্রের মাধ্যমে গৃহীত যুক্তিভিত্তিক সিদ্ধান্তকে বলা হয় কিয়াস।"

ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, "কিয়াস হল আইনের বিস্তৃতি। মূল আইন যখন সমস্যার সমাধানে যথেষ্ট না হয়, তখন মূল আইন থেকে ইল্লাতের মাধ্যমে নতুন বিধি আহরণ করতে হয়। আর তখন যে আইনের সম্প্রসারণ হয় তাই কিয়াস।"

মূলত মূল আইনকে শাখায় তুলনা করেই নতুন আইনের জন্ম হয়। আর এটিই হল কিয়াস।

উদাহরণ : কুরআন মাজীদের মাধ্যমে ইসলামী শরীআতে মদ্যপানকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। কারণ হলো 'নেশা'। অনুরূপভাবে গাঁজা, আফিম, হিরোইন ইত্যাদি নেশা জাতীয় জিনিসকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে।

২.২ কিয়াসের উৎপত্তি

ইসলামী আইন শাস্ত্রের মূলনীতিকে যে চারটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে কিয়াস হল তার সর্বশেষ স্তর। কোন সমস্যার সমাধানে যখন কুরআন ও হাদীস হতে সরাসরি কোন নির্দেশনা না পাওয়া যায় তখন ইসলামী পণ্ডিতগণ কিয়াসের আশ্রয় নিয়ে উদ্ভূত সমস্যাটি সমাধান করেন।

শরীআতের যে সমস্ত বিধি-বিধানের সমস্যার স্পষ্ট কোন সমাধান কুরআন বা হাদীস বা ইজমায় পরিষ্কার উল্লেখ নেই এরূপ ক্ষেত্রে কিয়াস প্রয়োগ হয়ে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) যখন তাঁর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মুআয ইবন জাবাল (রা)-কে ইয়েমেনের শাসনকর্তা মনোনীত করে পাঠান, তখন তিনি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন নতুন সমস্যার উদ্ভব হলে তিনি (মুআয) কী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন? তিনি জওয়াব দিলেন যে, তিনি আল-কুরআনের অনুসরণ করবেন। মহানবী (স) তাঁকে প্রশ্ন করলেন, "যদি কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশ না থাকে?" তখন মুআয (রা) উত্তর দিলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাহর (হাদীসের) অনুসরণ করবেন। আর রাসূল (স)-এর সুন্নাহর দ্বারা ফায়সালা করতে না পারলে তিনি তাঁর নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করবেন। রাসূলে করীম হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর (মুআযের) এ জবাবে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করলেন। তাঁর জন্য দুআ করলেন এবং ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগে তাঁকে উৎসাহিত করলেন।

অন্য একটি হাদীসে আছে, হযরত মুহাম্মদ (স) আবু মূসা আল-আশআরীকে বললেন, "আল্লাহর কিতাব (কুরআন) অনুযায়ী বিচার কর। তোমার যা প্রয়োজন, তা যদি এতে না থাকে তবে মহানবী (স)- এর সুন্না হতে খোঁজ কর। সেখানেও যদি না পাও তখন নিজের মতামত ব্যক্ত কর।"

২.৩ কিয়াসের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

ইসলাম একটি যুক্তি ভিত্তিক গতিশীল জীবন ব্যবস্থা। জীবন জিজ্ঞাসার সাথে সম্পর্কিত সকল সমস্যার সমাধান ইসলাম প্রদান করছে। হযরত মুহাম্মদ (স) জানতেন সময়ের বিবর্তনে মানব সমাজে নানারকম সমস্যার উদ্ভব ঘটবে। সে সব সমস্যা হতে তাঁর উম্মতকে বাঁচানোর জন্য তিনি সমাধানের পথ হিসেবে ইজমা ও কিয়াসের পথ খুলে রেখেছেন।

রাসূল (স)-এর জীবদ্দশায়ও কিয়াস সংগঠিত হয়েছে। তখন কোন সংকট দেখা দিলে কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে ঐ সমস্যার সমাধান দিতেন। মহান আল্লাহ বলেন-

وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ

"তাদের কাজকর্ম সম্পন্ন হয় তাদের মধ্যকার পরস্পর পরামর্শের ভিত্তিতে।"

রাসূল (স)-এর ইন্তিকালের পর আসমানী বার্তা প্রেরণ বন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া মুসলিম সাম্রাজ্যের পরিসীমা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। নব বিজিত মুসলিম সাম্রাজ্যের সাথে নতুন সংস্কৃতি ও সভ্যতার পরিচয় ঘটে। ফলশ্রুতিতে নতুন নতুন নানা সমস্যার উদ্ভব হয়। এমতাবস্থায় সাহাবাগণ কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে নতুন সমস্যার সমাধান দিতে থাকেন।

প্রথম হিজরী শতাব্দীর শেষ দিকে ফিকহ শাস্ত্রের বিকাশ ঘটে। ফকিহগণ কুরআন ও হাদীসের নিরিখে চিন্তা ও গবেষণার সমন্বয় ঘটাতেন। সম্ভবত ইমাম শাফিঈ প্রথম ব্যক্তি যিনি উসূলে ফিকহের সংকলন চেষ্টা করেন এবং ইসলাম ধর্মীয় ও বিচার ব্যবস্থায় কিতাব, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। তিনি বলেন- "কিয়াসের ব্যবহার সে সময় করা যাবে যখন কিতাব, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।" (আর রিসালাত-পৃ. ৬৫)

সুতরাং কুরআন, হাদীস, ইজমা দ্বারা সমাধান বের করতে না পারলে কেবল কিয়াসের আশ্রয় নিতে হবে।

২.৪ কিয়াসের-এর নীতমালা

মহানবীর (স) ইন্তিকালের পর সাহাবীগণ কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাথে কিয়াসের অনুসরণে নতুন নতুন সমস্যার সমাধান করতেন। পরবর্তীকালে ইসলামের মাযহাব চতুষ্টয়ের ইমামগণও কিয়াস প্রয়োগ করতেন। কিয়াস এমন সব সমস্যার সমাধান করে যা কুরআন-হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ নেই। কাজেই আইনের দৃষ্টিতে কিয়াসের মান কুরআন-হাদীসের সমতুল্য নয়। ইমামগণ নিম্নলিখিত নীতিমালার উপর লক্ষ্য রেখে কিয়াস গ্রহণ করতেন-

ক. কিয়াস কুরআন-হাদীস ও ইজমার পরিপন্থী হবে না।

খ. কুরআন-হাদীস ও ইজমা দ্বারা প্রবর্তিত কোন আইনের মূলনীতি বিরোধী কোন আইন তৈরি করা কিয়াসের আওতা বহির্ভূত।

গ. কিয়াসের মূলনীতি বা এর তাৎপর্য মানুষের জ্ঞানের পরিসীমার মধ্যে থাকতে হবে।

ঘ. যে সকল সমস্যার সমাধান কুরআন ও হাদীস বা ইজমা দ্বারা করা হয়েছে, সে সকল বিষয়ে কিয়াস প্রযোজ্য নয়।

সারকথা

মানবসমাজ গতিশীল। যতই দিন যেতে থাকে মুসলিম সমাজে নতুন নতুন প্রশ্নের উদ্ভব ঘটে। বহু নতুন সমস্যাবলি স্বাভাবিকভাবে দেখা দিতে থাকে। নতুন উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের জন্য ইজতিহাদ-গবেষণার প্রয়োজন হয়। কিয়াস ইসলামী আইন-বিজ্ঞানের এক গতিশীল ধারা। কিয়াস আইনকে কালোত্তীর্ণ এবং সার্বজনীনতা দান করেছে। ইসলামী আইন-বিজ্ঞান যে সর্বকালের মুক্তিসনদ তা এ থেকেই বুঝা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৭.২

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

এক কথায় উত্তর দিন–

১. কিয়াসের আভিধানিক অর্থ কি?
২. কিয়াসের শাব্দিক অর্থ কি?
৩. গাঁজা, আফিম ও হিরোইন নিষিদ্ধ হয়েছে কেন?
৪. কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা সমাধান করা যায় না এমন বিষয়ে কিসের ভিত্তিতে ফয়সালা করতে হবে?
৫. কিয়াসের পথ কে খুলে দিয়েছেন?
৬. রাসূলের (স) যুগে কোন কিয়াস সংগঠিত হয়েছিল কি?
৭. কোন বিষয়ে কিয়াস করা যাবে?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. কিয়াসের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা লিখুন।
২. ইসলামী শরীআতের উৎস হিসেবে কিয়াসের গুরুত্ব নিরূপণ করুন।
৩. ইমামগণ কোন নীতিমালার উপর ভিত্তি করে কিয়াস করতেন?

পাঠ ৩ ফিক্‌হ শাস্ত্রের পরিচয় ও এর উৎপত্তি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- ফিকহ শাস্ত্রের পরিচয় দিতে পারবেন;
- ফিকহ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- ফিকহ শাস্ত্রের উৎপত্তির কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

৩.১ ফিক্‌হ শাস্ত্রের পরিচয়

ফিক্‌হ শব্দের আভিধানিক অর্থ বুদ্ধিবৃত্তি, প্রজ্ঞা, গভীর জ্ঞান ও সূক্ষ্মদর্শিতা। ইসলামী পরিভাষায় শরীআতের ব্যুৎপন্ন ও অভিজ্ঞ আলেমদের কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে গভীর গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাইয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্রকে ফিক্‌হ শাস্ত্র বলে। এক কথায় বিশদ প্রমাণাদি সহকারে ব্যবহারিক জীবনের কর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে শরীআতের বিধানসমূহ (আহকাম) সম্পর্কে গভীর জ্ঞানকে ফিক্‌হ বলে। আর যে শাস্ত্রে মুসলমানদের ব্যবহারিক জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কিত শরীআতের বিধি-বিধান ইত্যাদি খুঁটিনাটি আলোচিত হয় তাকে 'ইলমুল ফিক্‌হ' বলে।

মহান আল্লাহ মানব জীবন পরিচালনার জন্য মানব প্রকৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক জীবন ব্যবস্থা প্রদান করেছেন। ফিক্‌হ শাস্ত্র হচ্ছে ইসলামী আইন বিজ্ঞান। এর সকল বিধি-বিধান কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উৎসারিত। মহানবীর (স) জীবদ্দশায়ই এর মৌল কাঠামো পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। পরবর্তীতে যুগ জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে মুসলিম মনষীদের গবেষণায় এটি ইলমে ফিক্‌হ বা ফিক্‌হ শাস্ত্র বা "ইসলামী আইন বিজ্ঞান" রূপে রূপায়িত হয়।

হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষ দিকে অনেক মুসলিম মনীষী কুরআন ও হাদিসের ওপর গবেষণা চালিয়ে তা থেকে জীবন যাপনের বাস্তব কর্মপন্থা বের করার চেষ্টা করেন। তাদের গবেষণার ফল হচ্ছে ফিক্‌হ শাস্ত্র বা আইন-বিজ্ঞান।

৩.২ ফিক্‌হ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা

ফিক্‌হের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মহানবী (স) বলেন–

لِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ وَعِمَادُ هٰذَا الدِّيْنِ اَلْفِقْه

"প্রত্যেক বস্তুর কতকগুলো স্তম্ভ আছে। আর ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে আল-ফিক্‌হ"। (বায়হাকী)

مَجْلِسُ فِقْهٍ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً

"ফিক্‌হের একটি মজলিস (৬০) ষাট বছর ইবাদাতের চেয়েও উত্তম।" (তাবরানী)

কুরআন ও হাদীসের আলোকে ফক্বীহগণ বলেন, দৈনন্দিন জীবনে জরুরি মাসআলা শিক্ষা করা ফরযে আইন এবং এর চেয়ে বেশি শিক্ষা করা ফরযে কিফায়া।

কুরআন ও হাদীসে ইসলামী শরীআতের বিধি-বিধান বিন্যস্ত অবস্থায় নেই। আহকামে শরীআতকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা না হলে সাধারণ মানুষতো দূরের কথা শিক্ষিত ব্যক্তিদের পক্ষেও আল্লাহর আইন অনুযায়ী চলা সম্ভব হত না। তাছাড়া নিত্য-নতুন সমস্যাগুলো সমাধানের উদ্দেশ্যে কুরআন ও হাদীসের গবেষণামূলক ব্যাখ্যা দিয়ে মানব কল্যাণমূলক বিধান প্রস্তুত করা জনসাধারণের পক্ষে সহজ নয়। ইসলামের প্রাজ্ঞ মনীষীগণ অক্লান্ত সাধনার ফলে ফিক্‌হ শাস্ত্র প্রণয়নে এগিয়ে আসেন। এর উদ্ভাবন ও উৎপত্তির কারণসমূহ বিশ্লেষণ করলে এর প্রয়োজনীয়তা বুঝা যাবে।

৩.৩ ফিক্‌হ শাস্ত্রের উৎপত্তির কারণ

মহানবীর (স) জীবদ্দশায় শরীআর যাবতীয় ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তিনি অহীর আলোকে প্রদান করতেন। তাঁর তিরোধানের পর সাহাবীগণ আল-কুরআন ও হাদীসের আলোকে যাবতীয় সমস্যার সমাধান দিতেন। তাবি'ঈ ও

তাবি-তাবি'ঈনের যুগেও এ ধারাই চলতে থাকে। তবে সাহাবী, তাবি'ঈ এবং তাবি'ঈনের সময় কুরআন ও সুন্নাহর সাথে তাঁদের বুদ্ধি-বৃত্তি এবং অভিজ্ঞান দ্বারাও কিছু নতুন সমস্যার সমাধান দিতেন। তখন থেকেই ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে শুরু করে।

নব নব যুগ সমস্যা : গতিশীল জীবনের প্রয়োজনে জটিলতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। নতুন নতুন প্রশ্ন ও সমস্যা দেখা দেয়। সেসব সমস্যার সমাধান দিতে কেবল কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান থাকাই যথেষ্ট নয় বরং গবেষণা, প্রজ্ঞা ও উদ্ভাবনী অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। সাহাবা, তাবি'ঈ ও তাঁদের অনুগামীগণের মধ্যে যারা এরূপ গুণে গুণান্বিত ছিলেন- মুসলিম জগৎ তাঁদের গবেষণা, ইজতিহাদ ও ফয়সালার উপর নির্ভর করত। তাঁরা কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবাদের সমাধান বহাল রেখে নতুন সমস্যার ব্যাপারে সমাধান দিয়েছেন। এছাড়া ভবিষ্যতে আরো যে সকল নতুন সমস্যা সৃষ্টি হবে সেগুলো সমাধানের মূলনীতি (জম্বশ্ছ৫) ও পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ফলে "উসূলুল ফিক্‌হ" নামক এক নতুন বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়।

আইন সুসংবদ্ধকরণ : কুরআন ও সুন্নাহ থেকে হুকুম-আহকাম খুঁজে বের করে সাধারণের পক্ষে আমল করা সহজ ছিল না। এমতাবস্থায় "ইসলাম একটি দুর্বোধ্য নীতি নিয়ে এসেছে"- এ ধারণা দূরীভূত করার জন্য ইসলামী আইন-বিধানের সুসংবদ্ধ করা অনিবার্য হয়ে পড়ে। এসব কারণে ও প্রয়োজনে সাহাবীদের যুগেই ফিক্‌হ শাস্ত্রের উদ্ভব হয়। তবে তাবি'ঈনের যুগে শাস্ত্রাকারে এর সংকলন শুরু হয়। এর পর তাবি-তাবি'ঈনের যুগে তথা আব্বাসীয় খিলাফতকালে বিধিবদ্ধ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে 'ফিক্‌হ শাস্ত্রের" ব্যাপক সংকলন ও সম্পাদনা সম্পন্ন হয়।

৩.৪ ফিক্‌হ শাস্ত্র পাঠের উপকারিতা

ফিক্‌হ শাস্ত্র পাঠ করলে ইসলামী আইন-কানুন তথা শরীআতের যাবতীয় বিধি-বিধান জানা যায়। অর্থাৎ ফিক্‌হ শাস্ত্র পাঠে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদি সম্পর্কে শরীআতের বিধানসমূহ সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

৩.৫ ফিক্‌হ শাস্ত্রের মূল উৎস বা ভিত্তি

ফিক্‌হ শাস্ত্রের মূল উৎস বা ভিত্তি চারটি। (ক) কুরআন, (খ) হাদীস, (গ) ইজমা ও (ঘ) কিয়াস। প্রথম দুটির ওপর পরবর্তী দুটি নির্ভরশীল।

(ক) কুরআন

শরীআতের প্রথম ও প্রধান উৎস হচ্ছে কুরআন মাজীদ। এটি শরীআতের অকাট্য দলিল। এর ওপরই শরীআতের মূল কাঠামো দণ্ডায়মান। আল-কুরআনে শরীআতের উৎস হিসেবে প্রায় পাঁচ শতাধিক আয়াত রয়েছে।

(খ) হাদীস

শরীআতের উৎস হিসেবে সুন্নাহ বা হাদীসের স্থান দ্বিতীয়। আল-কুরআন হচ্ছে শরীআতের মূল; আর সুন্নাহ এর ব্যাখ্যা। কুরআন মাজীদে শরীআতের সকল বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। আর হাদীস ঐ সব বিষয়ের বিশ্লেষণ। যেমন সালাত আদায় করা ফরয। তবে কিভাবে আদায় করতে হবে আল-কুরআনে তার উল্লেখ নেই। হাদীসে তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

(গ) ইজমা

শরীআতের তৃতীয় উৎস ইজমা। কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন আলিমগণের কোন সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে একমত হওয়াকে ইজমা বলে। বহু নতুন প্রশ্নের মীমাংসা প্রসঙ্গে সাহাবী, তাবিঈ ও তাবিঈ-তাবিঈনদের এরূপ একমত হওয়ার বিবরণ পাওয়া যায়। যে সকল বিধানে ঐকমত্য স্থাপিত হয়েছে, বিশেষত সাহাবীদের ঐকমত্যযুক্ত বিধানসমূহ মুসলমানদের পক্ষে অবশ্য পালনীয়, এর বিরোধিতা করা চলবে না।

(ঘ) কিয়াস

শরীআতের চতুর্থ উৎস কিয়াস। যে বিষয় সম্পর্কে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায় সুস্পষ্ট বিধি-বিধান পাওয়া যায় না, সে ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে প্রদত্ত অনুরূপ প্রশ্নের মীমাংসাকে ভিত্তি করে যুক্তি প্রয়োগে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করা হয়, এ ধরনের যুক্তি প্রয়োগকে কিয়াস বলা হয়। সাহাবী, তাবিঈ ও তাবি-তাবিঈগণ এ পদ্ধতিতে শরীআতের বহু নতুন নতুন প্রশ্নের সমাধান দিয়েছেন। এটি কুরআন ও হাদিসের সমতুল্য নয়; বরং সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধান।

৩.৬ ফিকহ্ শাস্ত্রের বিষয়বস্তু

ফিকহ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে শরীআতের হুকুম-আহকাম। শরীআতের অনুসারী তথা মুকাল্লাফ হরূল্লে অর্থাৎ বালিগ ও জ্ঞানবান মানুষের কর্ম ও আমল নিয়ে আলোচনা। ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, মুস্তাহাসান, মুবাহ, জায়িয, নাজায়িয, হালাল, হারাম, মাকরূহ, তাহ্রীমী ও মাকরূহ তানযীহি ইত্যাদি নির্দেশ করা হয়। তাই শরীআতের অনুসারী মানুষের কর্ম ও আমলই হল ফিকহ শাস্ত্রের বিষয়বস্তু।

৩.৭ ফিক্হ্ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়কে ছয় ভাগে ভাগ করা যায়-

১. ইবাদাত : আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর বান্দার মধ্যে গভীর সংযোগকারী বিষয় হল ইবাদাত।

২. মু'আমালাত : সামাজিক জীবনের লেন-দেন যেমন, অর্থনৈতিক নিয়ম-কানুন যা পরস্পর সাহায্য সহায়তা দান ও যৌথ কাজের জন্য নির্ধারিত। যেমন, বেচা-কেনা, লেন-দেন, ধার-কর্জ, আমানত ইত্যাদি।

৩. মুনাকিহাত : বৈবাহিক বিষয়াদি তথা মানব বংশ বজায় রাখা সম্বন্ধীয় আইন-কানুন। যেমন-বিবাহ, তালাক, ইদ্দত, বংশ, আধিপত্য, ওয়াসিয়াত, উত্তরাধিকার ইত্যাদি।

৪. উকূবাত : অপরাধ ও শাস্তি। যেমন- হত্যা, চুরি, যিনা, দুর্নাম-অপবাদ এর হূদূদ, কিসাস, দিয়াত ইত্যাদি বিষয়ক আইন-কানুন।

৫. মুখাসামাত : বিচার সংক্রান্ত বিষয়াদি।

৬. হুকুমাত ও খিলাফত : জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদি। লেন-দেন, সন্ধি ও যুদ্ধের নিয়ম-কানুন, রাষ্ট্রীয় উচ্চ পদমর্যাদার বিস্তারিত বিষয়াদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৭.৩

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি খাতায় লিখুন-

১. ফিকহ শব্দের আভিধানিক অর্থ-

ক. বুদ্ধিবৃত্তি খ. গভীর জ্ঞান

গ. সূক্ষ্মদর্শিতা ঘ. সব কয়টি ঠিক

২. ব্যবহারিক জীবনের কর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে শরীআতের বিধানসমূহকে যে শাস্ত্রে আলোচিত হয় তাকে কি বলে?

ক. ফিকহ শাস্ত্র খ. আইন শাস্ত্র

গ. শরীআত ঘ. আকাইদ শাস্ত্র

৩. কিসের একটি মজলিস ৬০ বছরের ইবাদাতের চেয়েও উত্তম?

ক. ওয়াজের মজলিস খ. ফিকহের মজলিস

গ. ইবাদাতের মজলিস ঘ. খিলাফতের মজলিস

৪. ফিকহ শাস্ত্রের মূলনীতি বিষয়ক শাস্ত্রের নাম কি?

ক. উসূলুল ফিকহ খ. উসূলুল হাদীস

গ. উসুলুদ দ্বীন ঘ. উসুলুত্ তাফসীর

৫. ফিকহ শাস্ত্রের মূল উৎস কয়টি?

ক. ১০টি খ. ৪০টি

গ. ৪টি ঘ. ৩টি

৬. ফিকহ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে-

ক. ইবাদাত খ. মুয়ামালাত

গ. হুকুমাত ও খিলাফত ঘ. সব কয়টি

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ফিকহ শাস্ত্রের পরিচয় দিন।

২. ফিকহ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

৩. ফিকহ শাস্ত্রের উৎপত্তির কারণ লিখুন।

৪. ফিকহ শাস্ত্র পাঠের উপকারিতা বর্ণনা করুন।

৫. ফিকহ শাস্ত্রের মূল উৎস কয়টি ও কী কী?

৬. ফিকহ শাস্ত্রের বিষয়বস্তু লিখুন।

৭. ফিকহ শাস্ত্রের বিষয়বস্তুকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে? লিখুন।

পাঠ ৪ ফিক্‌হ শাস্ত্রের সংকলন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- ফিকহ শাস্ত্র সংকলনের পরিপ্রেক্ষিত ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ফিকহ শাস্ত্র সংকলনের সময়কাল বলতে পারবেন;
- ফিকহ সংকলনের যুগ বিভাগ ও প্রতিটি যুগের কার্যক্রমের বর্ণনা দিতে পারবেন;
- ফিকহ-এর প্রধান ইমামগণের নাম পরিচয় বলতে পারবেন।

৪.১ ফিক্‌হ শাস্ত্র সংকলনের পরিপ্রেক্ষিত

ইলমে ফিক্‌হ বিশাল ও বিস্তৃত এক বিজ্ঞান। মানবজীবনের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড শরীআতের নিক্তিতে পরিমাপ করে সীরাতুল মুস্তাকীমের পথের নির্দেশনা দেয় ফিক্‌হ শাস্ত্র। ইসলামী আইন-বিজ্ঞানের অনিবার্য প্রয়োজনে ফিকহ্ শাস্ত্র সংকলন শুরু হয়।

খুলাফায়ে রাশিদীন এবং পর্যায়ক্রমে সাহাবীদের ইন্‌তিকালের ফলে ইসলামী বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শরীআতের হুকুম আহকাম পালন ও চর্চার ক্ষেত্রে বড় ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। তাছাড়া হযরত আলী (রা)-এর শাহাদাত; হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রা) কর্তৃক উমাইয়া বংশের শাসন ভার দখল, তাঁর পুত্র ইয়াযিদ-এর সময়ে রাসূল (স)-এর নাতি ইমাম হুসাইন (রা)-এর হৃদয় বিদারক শাহাদাতবরণ। এসব কারণে ইসলামে নানা ফেরকা ও মতবাদের সৃষ্টি হয়। এ সময়ে বাতিলপন্থী খারেজী দলের উদ্ভব হয়। পরিণতিতে খিলাফতে রাশিদার পরিসমাপ্তির অব্যবহিত পরেই মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভক্তির সাথে সাথে ধর্মীয় দল-উপদলের সৃষ্টি হয়। প্রকৃত মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে "খারেজী" ও 'শীআ' মতাবলম্বী দুটি পৃথক উপদল গড়ে উঠে। খারেজীরা শুধু কুরআন মাজীদ ও প্রধানত প্রথম দুই খলীফার শাসনামলের প্রমাণিত হাদীসমূহকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে। শীআরাও চরমপন্থী উপদল, তারা নতুন নতুন ধ্যান-ধারণা অবলম্বন করতে থাকে।

উমাইয়া শাসনামলের মাঝামাঝি সময়ে হকপন্থী উলামা-ই কিরাম দু'ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েন। একটি ধারার পরিচিত নাম 'আহলুল হাদীস', যাঁরা হাদীসের যাহেরী অর্থ অনুসারে আমল করা জরুরি মনে করেন। কিয়াসের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান প্রক্রিয়া তারা অপছন্দ করতেন। দ্বিতীয় ধারার তৎকালীন পরিচিত নাম ছিল 'আহলুর রায়'। যাঁরা কুরআন মাজীদ ও হাদীসের আলোকে বুদ্ধিমত্তা ও যুক্তি তর্কের প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতায় ছিলেন বিশ্বাসী। তাঁরা কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট ও মৌলিক বিধানের কারণ-উপকারণ ও যুক্তিধারা নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে ইসলামী অনুশাসনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

ইসলামের ব্যাপক প্রসার ও বিভিন্ন সভ্যতা সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার কারণে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হতে থাকে। আর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এ সকল সমস্যার ইসলামী সমাধান সম্বলিত সুস্পষ্ট ও বিধিবদ্ধ আইন-কানুন তথা ফিকাহ ও উসূলে ফিকাহ প্রণয়নের। আবু হানীফা (র) প্রথমে এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। উমাইয়া যুগের পতনের পর পর তিনি তাঁর সঙ্গী-সাথীদের সমন্বয়ে একটি পর্ষদ গঠন করেন। এরই মাধ্যমে তিনি ফিকহ সংকলন ও সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব পালনে আত্মনিয়োগ করেন। এভাবে তিনি মুসলিম উম্মাহর জন্য এক বিরাট অবদান রেখে যান।

৪.২ ফিকহ সংকলনের সময় কাল

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম থেকেই ইসলামী জগতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নব জোয়ার শুরু হয়। এ সময় ব্যাপকভাবে হাদীস সংগ্রহ, সংকলন এবং ফিক্‌হ-এর মাসআলা সম্পাদনা ও ফাতাওয়া সংকলন শুরু হয়।

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর তৃতীয় দশক হতে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ফিক্‌হ সংকলন ও সম্পাদনা শুরু হয়। সে সময় হতে আজ পর্যন্ত সময়কালকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

১. গবেষণা ও সংকলনের যুগ; ২. পূর্ণতা ও তাকলীদের যুগ; ৩. তাকলীদের যুগ। এ তিনটি যুগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হল-

*** প্রথম যুগ গবেষণা ও সংকলনের**

এ যুগে ইমাম আবু হানীফা (র) নিয়মতান্ত্রিকভাবে সর্বপ্রথম ইসলামী ফিক্হ সংকলন ও সম্পাদনা শুরু করেন। তিনি তাঁর জীবনকালে ইসলামী ফিক্হ-এর উপর মূল্যবান গ্রন্থ রচনায় অবদান রাখেন।

তাঁর এ পথ ধরে এ যুগে আরো অসংখ্য মুজতাহিদ ফিক্হ সম্পাদনা ও সে বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। এ যুগেই আহলে সুন্নাহ ওয়াল জাম'আতের মাযহাব চার ফিক্হ সংকলিত ও সম্পাদিত হয়। এ যুগেই ফিক্হ শাস্ত্রের নীতি নির্ধারণী 'উসূল-ল ফিক্হ' নামক আরেকটি শাস্ত্রের উদ্ভব হয়। এ সময় মুসলিম উম্মাহ তাঁদের সম্পাদিত ফিকহ'র অনুসরণ করতে থাকেন। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর তৃতীয় দশক হতে তৃতীয় শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এ যুগ অব্যাহত থাকে। এ যুগকে বলা হয়, ইজাতিহাদ তথা গবেষণার যুগ।

*** দ্বিতীয় যুগ পূর্ণতা ও তাকলীদের**

ফিকহ সংকলনের দ্বিতীয় যুগকে তাকলীদের যুগ বলা হয়। হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর শুরু হতে সপ্তম শতাব্দীতে আব্বাসীয় রাজবংশের পতন পর্যন্ত এ যুগ অব্যাহত ছিল। এ যুগে তাকলীদ ব্যাপকতা লাভ করে। প্রথম যুগের ইমামগণের উদ্ভাবিত নিয়ম নীতির সমর্থনে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়। এ সময়ে মানবজীবনের নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিলে তার ধর্মীয় সমাধান অনুসন্ধান করা হয়। প্রথম যুগের নির্ধারিত মূলনীতিসমূহের আলোকে মাসআলা উদ্ভাবনই ছিল এ যুগের ব্যাপক কাজ। এ যুগের লোকেরা বিশেষত চার ইমামের অনুসরণ করতে থাকেন। ছোট খাটো অন্যান্য ইমামদের ফিকহ-এর বিলুপ্তি ঘটতে থাকে। এ যুগের বিশেষ দিক হল-

- এ পর্বে নতুন কোন ইমামের উদ্ভব হয়নি।
- পূর্ববর্তী ইমামদের পূর্ণ অনুসরণ করা হতে থাকে এ যুগে।
- এ যুগে পূর্ববর্তী ইমামদের প্রদত্ত ফাতওয়াসমূহের ব্যাখ্যা এবং তার সমর্থনে যুক্তিতর্ক তুলে ধরেন।
- যুক্তিভিত্তিক গ্রন্থ রচনা হতে থাকে।

* তৃতীয় যুগ একান্ত তাকলীদের

হিজরী ৭ম শতাব্দীর মাঝামাঝি আব্বাসীয় শাসনের সমাপ্তির পর আজ পর্যন্ত তৃতীয় ও সর্বশেষ যুগ যা এখনো চলমান। মূলত এ যুগে ইজতিহাদ করার মত যোগ্যতাসম্পন্ন লোক না থাকার কারণে ইজতিহাদ প্রক্রিয়া থেমে যায়। ফলে আলিম ও সাধারণ জনতা তাকলীদ করতে হচ্ছে। এ যুগে নতুন কোন ইজতিহাদ হচ্ছে না। পূর্ববর্তী মুজতাহিদদের ফাতাওয়ার পূর্ণ অনুসরণ করা হচ্ছে। এ জন্য এ যুগকে বলা হয় একান্ত তাকলীদের যুগ। তবে এ যুগে অনেক ফাতওয়ার কিতাব রচিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

ফিকহ্-এর ইমাম : যে সকল মুজতাহিদ ও ফিক্হবিদের অক্লান্ত সাধনার ফলে ফিকহ শাস্ত্রাকারে সংকলিত হয় তাঁদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন- চার জন (১) ইমাম আবু হানিফা (র) (ইরাক : মৃত্যু ১৫০ হি.), (২) ইমাম মালিক (র) (মদিনা : মৃত্যু ১৭৯ হি.), (৩) ইমাম শাফিঈ (র) (মক্কা: মৃত্যু ২০৪ হি.) এবং (৪) ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) (ইরাক : মৃত্যু ২৪১ হি.)। ইমাম আবু হানিফার (র) দু'জন শিষ্য- ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) ফিক্হ শাস্ত্রবিদ হিসেবে বিশেষ খ্যাত ছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৭.৪

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি বেছে নিন-

১. ইলমে ফিকহ বিশাল ও বিস্তৃত এক বিজ্ঞান / এক ক্ষুদ্র বিজ্ঞান।

২. খারেজী ও শি'আ দুটো উপদলই চরমপন্থী / উদারপন্থী।

৩. উমাইয়া শাসনামলে হকপন্থী উলামা দুটি ধারায় / চারটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েন।

৪. যারা যাহেরী হাদীসের উপর আমল জরুরি মনে করেন তারা হলেন আহলুল হাদীস / আহলুর রায়।

৫. সর্বপ্রথম ফিকহ সংকলনের গুরুত্ব অনুভব করেন ইমাম আবু হানিফা / ইমাম বুখারী।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ফিকহ শাস্ত্র সংকলনের পরিপ্রেক্ষিত বিশ্লেষণ করুন।

২. ফিকহ সংকলন ও সম্পাদন যুগ বিভাগ নিরূপণ করুন।

৩. ফিকহ সংকলন ও সম্পাদন প্রথম যুগ সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

৪. ফিকহ সংকলন-সম্পাদনার দ্বিতীয় যুগের কার্যক্রম সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিন।

৫. নিরেট তাকলীদের যুগ সম্পর্কে টীকা লিখুন।

৬. ফিকহ-এর প্রধান ইমামগণ কারা?

মাযহাবের পরিচয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- মাযহাব কী, তা বলতে পারবেন;
- মাযহাবের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে পারবেন।

৫.১ মাযহাব-এর পরিচয়

মাযহাব (مذهب) আরবি শব্দ। আভিধনিক অর্থ হচ্ছে- পথ, মত, দল। "ইসলামী আইন-কানুন, আমল-মু'আমালাত ও ইবাদাত সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়সমূহ ব্যতীত সেগুলোর শাখা-প্রশাখায় ইসলামী আইন বিশারদগণের বিভিন্ন মতবাদকে মাযহাব বলে। অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা এবং হাদীসমূহের মধ্যে কোনটি অধিক প্রামাণ্য আর কোনটি কম নির্ভরযোগ্য এসব বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্যের কারণে মুসলিম সমাজে যে সকল ধর্মীয় আইন সংক্রান্ত মতবাদ সৃষ্টি হয়েছে তাকে মাযহাব বলে।

মুসলিম সমাজে প্রধানত চারটি মাযহাব বা মতবাদের উদ্ভব হয়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আলিমগণ এ চারটি মাযহাবের যে কোন একটির অনুসরণ বা তাকলীদ করাকে অবশ্য করণীয় বলে ফাতওয়া প্রদান করেন।

বিশ্বমুসলিম কর্তৃক সমাদৃত চারটি মাযহাব হচ্ছে-

ক. হানাফী মাযহাব : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতানুসারীকে হানাফী বলা হয়।
খ. মালিকী মাযহাব : ইমাম মালিক (র)-এর মতানুসারীকে মালিকী বলা হয়।
গ. শাফি'ঈ মাযহাব : ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতানুসারীকে শাফিঈ বলা হয়।
ঘ. হাম্বলী মাযহাব : ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-এর মতানুসারীকে হাম্বলী বলা হয়।

৫.২ মাযহাবের পার্থক্যের কারণ

ইসলামী শরীআতের ফিক্হী মাযহাবের পার্থক্যের অনেক যৌক্তিক কারণ রয়েছে যার কয়েকটি নিম্নরূপ-

প্রথমত, মহানবী (স)-এর হাদীস বিভিন্ন সাহাবী বর্ণনা করেন। অনেক বর্ণনাকারী তা অপরের নিকট বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনার ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং একই হাদীস বহু ক্ষেত্রে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ফলে বর্ণনার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে কিছুটা পার্থক্য দেখা দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, হাদীসের ব্যাখ্যার ব্যাপারেও মতপার্থক্য হয়েছে।

তৃতীয়ত, কখনও বর্ণনার সূত্রেও কোন দুর্বলতা দেখা দিতে পারে। যেমন বর্ণনাকারীদের মধ্যে কোন এক বা একাধিক ব্যক্তির বর্ণনা নির্ভরযোগ্য না হওয়া। সুতরাং এক ইমামের বিবেচনায় যে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য, তা হয়ত অন্য ইমাম গ্রহণ করতে রাজি হননি। তিনি হয়ত অন্য হাদীসটি গ্রহণ করেছেন।

চতুর্থত, বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত একই মর্মের হাদীসে একটি মর্মকে একজন ইমাম অধিকতর নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন। অপর ইমাম অন্য মর্মকে নির্ভরযোগ্য মনে করে গ্রহণ করেছেন।

পঞ্চমত, আল-কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যায় মতানৈক্য। এটিও মাযহাবের পার্থক্যের অন্যতম কারণ হতে পারে। একজন তাফসীরকার একটি আয়াতের এক ধরনের ব্যাখ্যা করেছেন। আর একজন অন্যরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। অবশ্য এসব শরীআতের কোন মৌলিক নির্দেশের (ফরযের) ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে পার্থক্য হয়নি; বরং মতপার্থক্য হয়েছে শাখা-প্রশাখায়। উদাহরণস্বরূপ ফজরের সালাত পড়া ফরয। এ ব্যাপারে কোন ইমামের মতানৈক্য নেই; বরং সকলেই একমত। মতানৈক্য রয়েছে আদায়ের সময়ের ব্যাপারে। একজন ইমাম ফজরের সালাত আলো-আঁধারে পড়া ভাল মনে করেন। অন্যজন ফরসা হবার পর পড়া ভাল মনে করেন। এ ব্যাপারে দুই ইমাম দুই হাদীস দ্বারা নিজেদের মতামত প্রমাণ করেছেন।

অনুরূপভাবে ইমামের পেছনে কিরাত পাঠ করতে হবে, না চুপ করে থাকতে হবে। এ ব্যাপারেও দুটি মত রয়েছে। প্রত্যেকেরই যুক্তির ভিত্তিতে হাদীস রয়েছে। এমন সব খুঁটিনাটি বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে।

ষষ্ঠত, যে সকল সমস্যার সমাধান কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যায় না এক্ষেত্রে ইজমা ও কিয়াসের সাহায্যে হুকুম প্রদানের ক্ষেত্রে এ মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। ফয়সালা যেমন দুইজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ আইনজ্ঞ মৌলিক আইনের ব্যাখ্যায় একমত হওয়া সত্ত্বেও এর ধারা-উপধারায় ভিন্ন ভিন্ন রায় প্রকাশ করে থাকেন। আর মুজতাহিদদের ভিন্ন মত পোষণ করা কোন দূষণীয় নয়; বরং মহানবী (স) বলেছেন, "যারা এ জাতীয় গবেষণায় আত্মনিয়োগ করবে, তারা নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছলে দুটি পুরস্কার পাবে, আর ভুল হলেও শ্রমের মর্যাদাস্বরূপ একটি পুরস্কার পাবে।"

সপ্তমত, বিতর্কমূলক প্রশ্নে আইনজ্ঞের পরামর্শ ও বিচারকের মীমাংসা যেমন, ইসলামী আইনের ব্যাপারে ফকীহদের ফাতওয়াও সেইরূপ। বিভিন্ন বিচারক ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করতে পারেন। যেসব ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহয় ফয়সালা পাওয়া যায় না, সেসব ব্যাপারে ফকীহদের ইজতিহাদ ও রায়ের ওপর নির্ভর করতে হয়। আর ঐ সব ইজতিহাদ ও রায়ের ব্যাপারে সব সময়ে মতৈক্যের আশা করা যায় না।

সারকথা

ইসলামী আইন-কানুন ও মূলনীতির গবেষণাকারী মুজতাহিদগণের মূল ও প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে কুরআন ও হাদীস। এক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা এবং হাদীসের বর্ণনা ও নির্ভরযোগ্যতায় ইমামদের মতপার্থক্যের কারণ থেকেই বিভিন্ন মাযহাবের উদ্ভব হয়েছে। তবে উক্ত পার্থক্যসমূহ শরীআতের মৌলিক বিষয়ে হয়নি, হয়েছে শাখা-প্রশাখায়। অতএব, সকল মাযহাবই সত্যাশ্রয়ী এবং অনুকরণীয়-অনুসরণীয়। যে কোন একটি মাযহাব অনুসরণ করলেই ইসলামের অনুসরণ করা হবে এবং মুক্তি পাওয়া যাবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৭.৫

সঠিক উত্তরটি লিখুন–

১. মাযহাব শব্দের আভিধানিক অর্থ-
   ক. পথ　　খ. দল
   গ. মত　　ঘ. সব কয়টি ঠিক
২. মুসলিম সমাজে প্রধানত চারটি ----- উদ্ভব হয়।
   ক. উপদলের　　খ. বিভিন্ন মতবাদের
   গ. মাযহাবের　　ঘ. ফেরকার
৩. কোন একটি মাযহাবের অনুসরণ বা তাকলীদ করা কি?
   ক. ফরয　　খ. ওয়াজিব
   গ. সুন্নাত　　ঘ. হারাম
৪. ইমাম আযম কে?
   ক. ইমাম মালিক　　খ. ইমাম শাফিঈ
   গ. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল　　ঘ. ইমাম আবু হানিফা
৫. ইমামগণের মাযহাবের পার্থক্যসমূহ হয়েছে-
   ক. শরীআতের মৌলিক বিষয়ে　　খ. শাখা-প্রশাখায়
   গ. কুরআন-হাদীসের বর্ণনায়　　ঘ. ব্যক্তিগত রেষারেষির জন্য

সংক্ষিপ্ত উত্তর ও প্রশ্ন

১. মাযহাব বলতে কি বোঝায়।
২. মুসলিম বিশ্বের প্রধান সমাদৃত মাযহাব কয়টি ও কি কি?
৩. মাযহাবের পার্থক্যের প্রধান চারটি কারণ বিশ্লেষণ করুন।

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- ইমাম আবু হানিফার পরিচয় দিতে পারবেন;
- তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণনা করতে পারবেন;
- ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর অবদান মূল্যায়ন করতে পারবেন;
- হানাফী মাযহাবের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

৬.১ জীবন চরিত

ইসলামী আইন শাস্ত্রের জগতে যে ক'জন মনীষী নিজেদের নাম কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করে গেছেন ইমাম আবূ হানিফা (র) তাদের অন্যতম। ইসলামী আইন শাস্ত্রের প্রদীপকে দুনিয়ার একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে প্রজ্বলিত করার কারণে মুসলিম মনীষীগণ তাকে ইমাম-ই-আযম বা শ্রেষ্ঠ ইমাম নামে ভূষিত করেন। তিনি ছিলেন প্রখর প্রজ্ঞা ও তুখোড় যুক্তিবাদী। পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁর মত চৌকস ব্যক্তিত্ব বিরল।

ইমাম আবূ হানিফা (র)-এর প্রকৃত নাম নুমান ইবনে সাবিত। কুনিয়াত বা উপনাম আবূ হানিফা। পিতার নাম সাবিত। ইমাম আবু হানিফার উপনাম দ্বারাই হানাফী সম্প্রদায়ের নামকরণ করা হয়। তিনিই হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা।

ইমাম আবূ হানিফা (র) মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুণ্যভূমি বর্তমান ইরাকের কুফা নগরীতে ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন প্রখ্যাত আলিম এবং ফিকহশাস্ত্রের বিশ্ববরেণ্য পণ্ডিতে পরিণত হয়েছিলেন।

ইমাম আবূ হানিফা (র) বাল্যকাল হতেই অসাধারণ মেধার অধিকারী ছিলেন। প্রাথমিকভাবে তিনি তৎকালীন ইসলামী বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র কুফা নগরীতেই জ্ঞান অর্জন করেন। ১২ বছর বয়সে তিনি হযরত মুহাম্মদ (স) এর খাদেম আনাস (র)-এর খেদমতে উপস্থিত হন।

ইমাম আবু হানিফা (র) প্রথমে কুরআন হাদীস এবং আরবি ভাষায় গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তারপর তিনি দীর্ঘকাল দর্শন ও কালাম শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এরপর ফিকহ শাস্ত্রে গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। তিনি কুফার বিখ্যাত ফকীহ মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমান এর প্রতিষ্ঠিত "মাদরাসাতুর রায়"-এ পড়াশুনা করেন।

ইমাম আবূ হানিফার প্রাথমিক কর্মজীবন একজন কাপড় ব্যবসায়ী হিসেবে আরম্ভ হয়। সততা ও কর্মনিষ্ঠা দ্বারা তিনি অতি অল্প সময়েই ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করেন। সমসাময়িককালে তিনি অন্যতম ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হন। পরবর্তীতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনে সুলাইমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "মাদরাসাতুর রায়"-এ শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১২০ হিজরীতে ইমাম হাম্মাদের ইন্তিকালের পর আবূ হানিফা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

খলিফা ওমর ইবন আব্দুল আযীযের ইন্তিকালের পর তিনি উমাইয়া খলিফাদের বিরাগভাজনে পরিণত হন। খলিফা ইমামকে নিজ দলে ভেড়াতে চাইলেন। এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে ইমাম আবূ হানিফাকে (র) কারারুদ্ধ করা হয় এবং সৈন্যরা প্রতিদিন তাঁকে বেত্রাঘাত করে।

ইমাম আবূ হানিফাকে (র) এক সময়ে কারাগারে অজ্ঞাত ব্যক্তি কর্তৃক বিষ পান করানো হয়। তিনি ১৫০ হিজরীতে নামাযে সিজদারত অবস্থায় ইন্তিকাল করেন।

৬.২ ইসলামী আইন শাস্ত্রে তাঁর অবদান

ইসলামী আইন শাস্ত্রে আবু হানিফার ভূমিকা সুবিশাল। ইমাম আবূ হানিফা (র)-এর শ্রেষ্ঠ অবদান তিনি হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি মানবজীবনের নানা জিজ্ঞাসা এবং উদ্ভূত সমস্যার কুরআন, সুন্নাহ এবং গবেষণা প্রসূত যৌক্তিক সমাধান প্রদান করেন।

ইমাম আবূ হানিফা ফিকহ শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। এটা সর্বজন বিদিত যে, তিনিই সর্বপ্রথম কুরআন ও হাদীসের উপর গবেষণা করে ইসলামী আইন কানুন প্রণয়ন করেন।

ইমাম সাহেব আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কুরআন মাজীদকেই অধিকতর গুরুত্বারোপ করতেন। তিনি যে কোন জটিল প্রশ্নের সমাধান কুরআনের আলোকে প্রদান করতেন। কুরআনের পর তিনি হাদীসের উপর নির্ভর করতেন।

ইমাম আবূ হানিফা (র) এর অন্যতম অবদান হলো উসূলে ফিকহ'র উদ্ভাবন। তিনি বিষয়টির যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ফিকহ সংকলনের পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি নিজে বলেছেন, "আমি সর্বাগ্রে কুরআনের সুস্পষ্ট বিধির অনুসরণ করি। সেখানে না পেলে হাদীসের অনুসরণ করি। আর সেখানে না পেলে সাহাবীদের যুক্তিযুক্ত অভিমত গ্রহণ করি। তাদের সকলের অভিমত পরিত্যাগ করে আমি নতুন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না।"

৬.৪ হানাফী মাযহাবের বৈশিষ্ট্য

ইসলামী শরীআতের চিন্তার সীমাহীন নীলিমায় বিশাল এক আলোকপথ হানাফী ফিকহ শাস্ত্র। আজকের বিশ্বের দেড়শত কোটি মুসলমানের শতকরা পঁচাত্তরজনই তাঁর প্রণীত ফিক্হী মাযহাবের অনুসারী। হানাফী ফিক্হের কতিপয় বৈশিষ্ট্য এখানে তুলে ধরা হল :

(১) আল-কুরআনের গুরুত্ব

হানাফী ফিকহের মূলভিত্তি হলো আল-কুরআন। আল-কুরআনের উপস্থিতিতে হাদীসের আশ্রয় খুব কম নিতেন।

(২) হিকমত ভিত্তিক ফিক্হ

ইমাম আবূ হানীফার (র) ফিকহ'র প্রত্যেকটা মাস'আলা, তত্ত্ব, তথ্য, হিকমত ও মানুষের কল্যাণকারিতার উপর পর্যালোচনার ভিত্তিতে গৃহীত হতো। যেমন অন্যান্য ইমামগণ যখন সালাত বা অন্যান্য ফরয বিষয়কে এজন্য ফরয মনে করতেন যে, শরীআত প্রবর্তকের নির্দেশ। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র) সালাত বা অন্যান্য ফরযসমূহের কল্যাণকারিতার দৃষ্টিকোণ যাচাই করতেন। যেমন সালাত সম্বন্ধে বলা হয়েছে-

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ

"সালাত মন্দ ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে।"

এমনিভাবে সাওমের উপকারিতা হলো তাকওয়া অর্জন।

(৩) সরল-সহজ ফিক্হ

হানাফী ফিকহ্ অন্যান্য মাযহাব অপেক্ষা খুবই সহজ-সরল, যা সাধারণত মানুষের জন্য কল্যাণকর। মানুষের সাধ্য ও সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এ মাযহাব প্রণীত হয়েছে। চোরের হাত কাটার হুকুম প্রসঙ্গে-

* হানাফী ফিক্হ মতে ন্যূনতম এক আশরাফী বা স্বর্ণমুদ্রা বা ঐ পরিমাণ অর্থ চুরি না করলে হাত কাটা যাবে না।

* অন্যান্য ইমামের মতে ন্যূনতম ১/৪ স্বর্ণমুদ্রা চুরি করলেই হাত কাটা যাবে। এই মতামত বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, হানাফী ফিক্হ মানব কল্যাণকর এবং সহজ-সরল।

(৪) মানবিক আবেদন

সাধারণ মানুষের পার্থিব প্রয়োজনাদি তথা লেনদেন ও আচার আচরণের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র) মানবিক আবেদনে সাড়া দিয়ে অন্তর্দৃষ্টি ও উপলব্ধির সাথে সমাধান দিয়েছেন। অথচ অন্যান্য ইমামগণ তার বিপরীতে বাহ্যিক নস ও প্রকাশ্য কিয়াস দ্বারা মাস'আলা ও সমস্যার সমাধান করেছেন। যেমন বিবাহের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে কন্যা নিজ বিবাহের ব্যাপারে মত প্রকাশে পুরুষের ন্যায় স্বাধীন। অন্যান্য ইমামের মতে কন্যা স্বাধীন নয়।

(৫) অমুসলিমদের স্বাধীনতা দানকারী

হানাফী ফিকহ্ ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম জিম্মীদেরকে উদার দৃষ্টিতে গ্রহণ করে তাদের অধিকার নিশ্চিত করে। যেমন-

হানাফী ফিকহ্ মতে যিম্মির রক্ত মুসলমানদের ন্যায় নিরাপদ। অর্থাৎ, যিম্মীকে হত্যার অপরাধে কিসাস তথা মৃত্যু দণ্ডাদেশ দেওয়া যাবে।

* ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর মতে যিম্মীকে হত্যা করার অপরাধে দিয়াত বা রক্তমূল্য ওয়াজিব হবে, মৃত্যুদণ্ড নয়। আবার ইমাম মালিকের (র) মতে দিয়াতের অর্ধেক ওয়াজিব।

(৬) শক্তিশালী মত গ্রহণ

হানাফী ফিক্হের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো কুরআন ও হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত বিষয়ে মতামত গ্রহণের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (রা) শক্তিশালী মত গ্রহণ করেন। যেমন- উযূর ক্ষেত্রে।

* ইমাম আবূ হানীফার (র) মতে উযূর ফরয ৪টি, যা কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে।
* ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর মতে উযূর ফরয ৬টি।

(৭) কিয়াসের উপর গুরুত্ব আরোপ

ইমাম আবূ হানীফা (র) ফিক্হের ক্ষেত্রে কিয়াসের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিয়াস ভিত্তিক রায় প্রদানে ইমাম আবূ হানীফা (র) যুক্তিগ্রাহ্য ও শক্তিশালী মতামত গ্রহণ করতেন।

(৮) সর্বজনীন ও ভারসাম্যপূর্ণ

ইমাম আবূ হানীফার (র) ফিকহ্-এর সার্বিক শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম কারণ হলো-এটা সর্বজনীন ও ভারসাম্যপূর্ণ ফিক্হ। এ মাযহাবে গোঁড়ামী আবার উঁচুমানের জটিল দার্শনিক তত্ত্ব পরিহার করা হয়েছে। হাদীস, পারিপার্শ্বিকতা ও প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে কিয়াস ও ইসতিহসান-এর ভিত্তিতে সর্বজন গ্রাহ্য করে সমাধান প্রণীত হয়েছে।

এ সব কারণে হানাফী ফিকহ মুসলিম মিল্লাতের নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ মাযহাব। পৃথিবীর সকল মুসলমানের শতকরা ৭৫ জন এই হানাফী ফিক্হের অনুসারী হয়ে সীরাতুল মুস্তাকীমের পথে আছে। হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ এখানেই।

হানাফী মাযাহাবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ

মৌলিক মাসআলার গ্রন্থ ছয়খানা, যা হানাফী মাযহাবের প্রবর্তক হযরত আবু হানিফা (র) এবং তাঁর শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর নিকট থেকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়ে আসছে।

এ গ্রন্থগুলো সংকলন করেছেন ইমাম মুহাম্মদ (র) (জন্ম-১৩২, মৃত্যু-১৮৯ হিজরী)।

১. আল মাব্সুত
২. আল জামিউল কাবীর
৩. আল জামিউস্ সাগীর
৪. আস্ সিয়ারুস সাগীর
৫. আস্ সিয়ারুল-কাবীর
৬. আয-যিয়াদাত

দ্বিতীয় স্তরের কিতাবসমূহকে "কুতুবুন্ নাওয়াদির" বলে। এ স্তরের প্রসিদ্ধ কয়েকটি গ্রন্থ হল–

১. কিতাবুল আমালী
২. কিতাবুল কাইসানিয়াত
৩. কিতাবুল রাক্কিয়াত
৪. কিতাবুল জুরজানিয়াত
৫. কিতাবুল হারুনিয়াত।

উল্লিখিত কিতাব ছাড়াও হানাফী মাযহাবের মাসআলা ও ফাতাওয়া সংক্রান্ত অসংখ্য কিতাব আছে। এদের মধ্যে নিচে কয়েকটির নাম দেওয়া হল :

১. আল-হিদায়া
২. আল-বাদাউস সানায়ে
৩. আল-মুহীত
৪. শারহুত-তাহাভী

৫. ফাতাওয়া কাযীখান
৬. আয-যাখীরাহ
৭. মুখতাসরুল কুদূরী
৮. কানযুদ্-দাকাইক
৯. আল-মুখতার
১০. মাজমাউল বাহরাইন ওয়া মুলতাকান নাহরাইন
১১. আল-ওয়াফী
১২. দুররুল-বিহার
১৩. ফাত্ওয়া তাতারখানিয়া
১৪. আল-বিকায়া
১৫. আল-ফাতাওয়া আল হিন্দিয়া
১৬. রাদ্দুল-মুহতার
১৭. আদ্-দুররুল মুখতার
১৮. বাহরুর-রাইক
১৯. ফাতাওয়া-ই-খাইরিয়া
২০. ফাতাওয়া-আল-বাযযাযিয়া

পাঠোত্তর মূল্যালয়নঃ ৭.৬

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

এক কথায় উত্তর দিন–

১. ইমাম আযম বা শ্রেষ্ঠ ইমামের নাম কি?
২. ইমাম আবু হানিফার (র) আসল নাম কি?
৩. হানাফী মাযহাবের নামকরণ কার নামে করা হয়েছে?
৪. ইমাম আবু হানিফা প্রথম কর্মজীবন কোথায় শুরু করেন?
৫. ইমাম আযম কোথায় কি অবস্থায় ইনতেকাল করেন?
৬. ইমাম আবু হানিফার শ্রেষ্ঠ অবদান কি?
৭. ইমাম আবু হানিফার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান কি?
৮. বিশ্বের কতভাগ মুসলিম হানাফী মাযহাবের অনুসারী?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইমাম আবু হানিফার (র) পরিচয় দিন।
২. হানাফী মাযহাবের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন।
৩. ইমাম আবু হানিফার (র) অবদান বিশ্লেষণ করুন।
৪. হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলির তালিকা প্রস্তুত করুন।

পাঠ ৭ ইমাম মালিক (র) ও তাঁর মালিকী মাযহাব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- ইমাম মালিকের পরিচয় দিতে পারবেন;
- ইমাম মালিকের জীবনী বলতে পারবেন;
- ইমাম মালিকের সংকলিত মুয়াত্তা কিতাবের মূল্যায়ন করতে পারবেন;
- তাঁর মালিকী মাযহাবের বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন।

৭.১ জীবনচরিত

ইমাম মালিক (র) হাদীস শাস্ত্রে এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। নানা প্রতিকূলতা ও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। হাদীস শাস্ত্র সংকলনে পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁর অবদান চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর বিশুদ্ধ বাণী অনাগত কালের উম্মতের নিকট উপস্থাপনের সাহসী প্রয়াসের প্রথম বাস্তব নমুনা হচ্ছে তাঁর অমর সংকলন মুয়াত্তা গ্রন্থ।

ইমাম মালিক (র)-এর মূল নাম হচ্ছে মালিক, কুনিয়াত আবু আব্দুল্লাহ, উপাধি হলো ইমাম দারুল হিজরাত। তাঁর পিতার নাম হলো- আনাস। ইমাম মালিক (র)-এর জন্ম হয়েছে হিজরি ৯৩ সালে।

তিনি তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন নিজের পরিবার থেকেই। তাঁর পিতা আনাস ইবনে মালিক (র) পিতামহ মালিক ইবন আবূ আমর মদীনায় হাদীস বিশারদ ছিলেন। তিনি তাদের থেকে হাদীসের উপর জ্ঞান অর্জন শুরু করেন।

ইমাম মালিক (র) প্রখ্যাত ফকীহ রাবিয়াতুর রায় এর নিকট ফিকাহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আব্দুর রহমান ইবনে হরমুযসহ যুহরী ও নাফে (র) প্রমুখের নিকট হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ইমামুল কুর্‌রা নাফে বিন আব্দুর রহমান থেকে ইলমে ক্বিরাত শিক্ষাগ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষকদের সংখ্যা ৩০০-৯০০ বলে জানা যায়।

তাঁর শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ইবনে শিহাব আয-যুহরী, ইবনে উমায়ের আবুয্ যিনাদ, হাশেম ইবনে ওরওয়া, ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীদ, আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার, মুহাম্মাদ আল-মুনকাদির। ইমাম সুয়ুতী তাঁর ৯৫ জন উস্তাদের নামের তালিকা প্রকাশ করেছেন।

এই জগদ্বিখ্যাত হাদীস সংকলকের নিকট থেকে সমসাময়িক কালের সেরা সেরা জ্ঞানপিপাসুগণ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক, আওজায়ী, ইবনে সা'দ, আশ শাফিয়া, শু'বা, সাওরী ও ইবনে উয়াইনা অন্যতম।

৭.৩ গবেষণা ও ইসলামী আইন প্রণয়ন

ইমাম মালিক (র) ইসলামী আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসের উপর ব্যাপক গবেষণা করেন। তিনি হানাফী মাযহাব থেকে ভিন্নভাবে তাঁর গবেষণা শুরু করেন এবং কিয়াস বা অনুমানকে পরিত্যাগ করেন। তিনি মানবজীবনে প্রয়োজনীয় নানা আইন কানুন প্রণয়ন করে তা পরবর্তীতে নিজস্ব মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত করেন।

ইমাম মালিক (র) হাদীস সংকলনে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন। তিনি সংগৃহীত হাদীসগুলো সঠিক ও সুন্দরভাবে যাচাই করে নিতেন। যে সকল হাদীস তাঁর নিকট সন্দেহজনক মনে হতো সেগুলো তিনি বাদ দিয়ে দিতেন।

তিনি ইসলামী আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মদীনার প্রচলিত রীতি-নীতির উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করতেন। ফলে তাঁর উদ্ভাবিত আইন-কানুন সকলের নিকট সহজবোধ্য। তাঁর উদ্ভাবিত সকল আইন-কানুনই সহজ, সরল ও স্বাভাবিক।

জীবনের অধিকাংশ সময়ই তিনি মদীনায় অতিবাহিত করেন। সে সময় তাঁকে হযরত আলী (রা)-এর বংশধরের পরিচয়ে খেলাফতের দাবিদার মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ বিদ্রোহের সাথে জড়িত করা হয়। ইমাম মালিক জনগণের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে খলিফা আল-মনসুরের বিরোধী ছিলেন। ৭৬২ সালে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মুহাম্মদ মদীনার অধিপতি হয়ে ইমাম বলে ফতোয়া জারি করলেন যে, আল-মনসুরের আনুগত্য বাধ্যতামূলক

নয়। কারণ তিনি আনুগত্য জোর করে আদায় করেছেন। মুহাম্মদের অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়ে গেলে ইমাম মালিক (র) মদীনার গভর্নর জাফর ইবনে সুলায়মান-এর বেত্রাঘাতে দণ্ডিত হন।

৭.৪ ইমাম মালিক (র)-এর মৃত্যু

ইমাম মালিক (র) ৮৪ মতান্তরে ৯৩ বছর বয়সে অসুস্থ হয়ে পড়লে ১৭৯ হিঃ সনে রবিউল আউয়াল মাসে মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়।

৭.৫ হাদীস সংকলন

ইমাম মালিক (র)-এর যুগ পর্যন্ত হাদীসশাস্ত্র ততটা সুবিন্যস্ত আকারে প্রকাশিত হয়নি। বিভিন্ন হাদীস বিভিন্ন জনের কাছে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। তিনি আব্বাসীয় খলীফা আল-মনসুরের অনুরোধে জনগণের জন্য সহজ সরল করে মুয়াত্তা রচনা করেন। হাদীসশাস্ত্রে মুয়াত্তার স্থান নির্ণয় করতে গিয়ে ইমাম শাফিঈ (র) বলেন–

مَا عَلٰى ظَهْرِ الْأَرْضِ كِتَابٌ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ اَصَحُّ مِنْ كِتَابِ مَالِكٍ

"আল্লাহর কিতাবের পর ইমাম মালিক (র) সংকলিত হাদীসের কিতাব অপেক্ষা অধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ দুনিয়ার বুকে আর একটিও নেই।"

* প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবু জুরয়া (রা) বলেন– "এতটুকু আস্থা ও নির্ভরতা অপর কোন কিতাবের উপর স্থাপিত হয়নি।"
* মিফতাহুস সায়াদাহ গ্রন্থকার বলেন– "মুয়াত্তার স্থান তিরমিযীর পরে।"
* শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র) ও আব্দুল আজীজ দেহলভী হাদীস গ্রন্থসমূহকে পাঁচটি স্তরে বিভক্ত করেছেন। তাঁরা মুয়াত্তাকে প্রথমে স্থান দিয়েছেন।
* আল্লামা নবভী (র) সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন- "আমি এমন একখানা কিতাব পেয়েছি যা বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসায়ী হতে উত্তম।"

৭.৬ মালিকী মাযহাবের বৈশিষ্ট্য

১. ইমাম মালিক (র) সকল যুক্তিতর্কের উপর কুরআন ও হাদীসের ভাষ্যকে প্রাধান্য দিতেন।
২. তাঁর ফিক্‌হ মদীনাবাসীদের আমলের উপর ভিত্তি করে রচিত।
৩. মালিকী মাযহাবে অমুসলিমদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকার দেওয়া হয়নি।
৪. তিনি সংস্কারমূলক আইন প্রণয়ন করেছেন।
৫. মাসআলার ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদ তাঁর ফিক্‌হের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
৬. এই মাযহাব প্রকাশ্য রিওয়াত অনুযায়ী রচিত, বিচার-বিশ্লেষণের অবকাশ তেমন নেই। এজন্য এ মাযহাব অত্যন্ত কঠোর।

ইমাম মালিক (র) কুরআন ও হাদীসকে অত্যন্ত কঠোর দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করতেন। তিনি তাঁর রেখে যাওয়া ফিক্‌হের মাধ্যমে চিরদিন অমর হয়ে থাকবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৭.৭

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি বেছে নিন–

১. ইমাম মালিকের মূল নাম মালিক / আনাস।
২. ইমাম মালিকের উপাধি ছিল ইমাম দারুল হিজরাত / আবু আবদুল্লাহ।
৩. ইমাম মালিকের জন্ম হচ্ছে হিজরী ৯৩ / ১৯৩ সালে।
৪. ইমাম মালিক (র) আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মদীনার / মক্কার প্রচলিত রীতিনীতির উপর গুরুত্বারোপ করতেন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইমাম মালিকের (র) পরিচয় দিন।
২. হাদীস সংকলনে ইমাম মালিকের (র) অবদান লিখুন।
২. মালিকী মাযহাবের বৈশিষ্ট্য লিখুন।

পাঠ ৮ ইমাম শাফিঈ (র) ও তাঁর মাযহাব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- ইমাম শাফিঈ (র)-এর পরিচয় ও জীবনী লিখতে পারবেন;
- ইমাম শাফিঈ (র)-এর অবদান বলতে পারবেন;
- ইমাম শাফিঈ (র)-এর মাযহাবের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

৮.১ জীবন কাহিনী

যে সমস্ত মনীষীর আপ্রাণ প্রচেষ্টায় ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রের ব্যাপক উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে ইমাম শাফিঈ (র) তাঁদের অন্যতম। তিনি শাফিঈ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। কুরআন ও সুন্নাহর সমন্বয় সাধন করে তিনি শক্তিশালী মতামত উপস্থাপন করেন।

ইমাম শাফিঈর (র) পূর্ণ নাম হলো আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইদরীস আশ-শাফিঈ। তাঁর উর্ধ্বতন বংশসূত্র কুরাইশ নেতা কুসাই-এর সঙ্গে সংযুক্ত। তিনি কুরাইশ বংশোদ্ভূত হাশিমী এবং রাসূল (স)-এর দূর সম্পর্কের আত্মীয় ছিলেন।

তিনি বর্তমান ইসরাঈল দখলীকৃত ফিলিস্তিনের গাজা ভূখণ্ডে ১৫০ হিজরী সনে (৭৬৭ খ্রি:) জন্মগ্রহণ করেন।

দু'বছর বয়সের সময় তাঁর পিতা মারা গেলে তাঁর মাতা উম্মুল হাসান গাজা ছেড়ে তাঁকে নিয়ে মক্কা নগরীতে উপস্থিত হন। মক্কাতেই তিনি লালিত-পালিত হন। কুরআন মাজীদ নিয়ে তার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। তিনি দশ বছর ধরে মক্কার বিখ্যাত হুযায়ল গোত্রে বসবাস করে আরবি ভাষা, সাহিত্য ও কাব্যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

ইমাম শাফিঈ (র) মাত্র দশ বছর বয়সে পূর্ণ কুরআন মাজীদ মুখস্থ করেছিলেন। তিনি মক্কার প্রসিদ্ধ মুফতী মুসলিম ইবন খালিদ যানজীর নিকট থেকে ফিক্হ শিক্ষা লাভ করেন।

তিনি পনের বছর বয়সে ফাতাওয়া দেওয়া শুরু করেন। তারপর তিনি মদীনায় উপস্থিত হয়ে সরাসরি ইমাম মালিক (র)-এর শিষ্যত্ব বরণ করেন এবং তার প্রণীত মুয়াত্তা তাকে শুনান। তিনি ইমাম মালিক (র)-এর নিকট থেকে বিপুল পরিমাণে ফিকহ শাস্ত্রের উপর জ্ঞান হাসিল করেছিলেন। ইমাম মালিক (র) তাঁর অপূর্ব মেধা, অনন্য ধীশক্তি ও অবিস্মরণীয় অধ্যয়ন পিপাসা দেখতে পেয়ে তাঁকে অত্যধিক সম্মান ও স্নেহ করতেন। তিনি অন্যান্য বিখ্যাত ফিকহ শাস্ত্রবিদদের নিকট থেকেও জ্ঞান অর্জন করেছিলেন।

এই জগদ্বখ্যাত ইসলামী আইন প্রণেতা ২০৪ হিজরি সনের রজব মাসের শেষ দিন (২০ জানুয়ারি ৮২০ খ্রি:) ফুসতাতে মৃত্যুবরণ করেন। মোকাত্তাম পর্বতের পাদদেশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

৮.২ ইমাম শাফিঈর (র) অবদান

ইসলামী আইনশাস্ত্রে তিনি যে অবদান রেখেছেন তা হলো-

ইমাম শাফিঈ শিয়া মতবাদ প্রচারের মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ১৮৭ হিজরি সনে। তাঁকে বাগদাদে খলিফা হারুন আর-রশীদের দরবারে হাজির করা হলে দরবারের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ফজল ইবন রাবি-এর সুপারিশে মুক্তি দেওয়া হয়।

ইমাম শাফিঈ ১৮৮ হি: সনে মক্কা, সিরিয়া হয়ে মিসরে উপস্থিত হন এবং ইমাম মালিকের শিষ্য হওয়ার সুবাদে মিসরের লোকজন তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫ হিজরি পর্যন্ত মিসরে অবস্থান করার পর পুনরায় ইরাকে গমন করেন এবং সেখানে অনেক দিন অতিবাহিত করেন।

হিজরি ১৯৫ সনে ইরাকে অবস্থানকালে সেখানকার আলিম-উলামা তাঁর শিক্ষা গ্রহণ ও যথার্থ সম্মানে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি সেখানকার আলিমগণের সহযোগিতায় হানাফী ও মালিকী মাযহাবের নির্যাস নিয়ে একটি মাযহাব প্রবর্তন করেন। ইসলামী ইতিহাসে একে শাফিঈ মাযহাব বলা হয়।

ইমাম শাফিঈ (র) কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে কোন সমস্যার সমাধান না দিতে পারলে কিয়াসের সাহায্য গ্রহণ করতেন। তাঁকেই ইসলামী ফিকহশাস্ত্রে সর্বপ্রথম কিয়াসের ব্যবহারকারী হিসাবে ধরা হয়।

ইমাম শাফিঈ (র) ফিকহ ও হাদীস শাস্ত্রের ব্যাপক উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন। তিনি নিজেকে বড় মাপের হাদীস ও ফিকহ বিশারদরূপে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। তাঁর ছাত্র ইমাম আহমদ (র) বলেন, "হাদীস বিশারদগণ ঘুমন্ত ছিলেন ইমাম শাফিঈ (র) তাদের জাগিয়ে তোলেন।"

ইমাম শাফিঈ (র) ফিকহ শাস্ত্রের গবেষণা ও চিন্তা ভাবনায় অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ছিলেন। তাঁর নিকট যা সঠিক বলে মনে হতো ঠিক তাই গ্রহণ করতেন। তিনি মূলত হানাফী ও মালিকী মাযহাবের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে শাফিঈ মাযহাবের ভিত্তি নির্মাণ করেন।

উসূলে ফিকহর সুশৃঙ্খল নিয়মাবলির উদ্ভাবনে ইমাম শাফিঈ যে অবদান রেখেছিলেন তা অন্য কোন ফকীহর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাঁর এই অসামান্য কৃতিত্বের উপর ভর করেই পরবর্তীকালের ফিকহ গবেষকগণ সামনে এগিয়ে যান।

ইমাম শাফিঈ একমাত্র ব্যক্তি যিনি (জম্বম্নজব্দঞ্জজল্লেক্ষশ্চ) বা ফিকহ পন্থী এবং (জম্বম্নজব্দঞ্জজম্নেস্ফ"রু) বা হাদীস পন্থীদের মাঝে দূরত্ব কমিয়ে একই সমতলে অবস্থান করার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তিনি এদেরকে কাছাকাছি নিয়ে এসে উভয়ের মাঝে এক মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনি মূলত হাদীসের মধ্যে পারস্পরিক বাহ্যিক হুকুমের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিরসন করেন। তিনি হাদীসের বাণীগুলোকে আইনের উৎস হিসেবে মনে করেন। তিনি কুরআন ও হাদীসের সাথে কোন রূপ পার্থক্য আনতে নারাজ।

ইমাম আবু হানিফা (র)-এর প্রচেষ্টায় ফিকহ শাস্ত্র বিষয়ক মূলনীতির প্রসার ঘটলেও তা সুবিন্যস্ত ও সুসংহতভাবে প্রতিষ্ঠা করেন ইমাম শাফিঈ (র)। আর এ কারণেই তাঁকে ফিকহ-বিজ্ঞান বা উসূলে ফিকহর প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

ইমাম শাফিঈ (র) তাঁর বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে বাহ্যত বিরোধী হাদীসগুলোর সুনিপুণ সমাধান করেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থ (জম্পুজৈল্পঞ্জজম্নেস্ফ"রু) ইখতিলাফুল হাদীসে পরস্পর বিরোধী হাদীসগুলো এমনভাবে সমন্বিত করেছেন যে, দুটি হাদীস থেকে দুটি মত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তার এ গ্রন্থটি সুধী মহলে বেশ সমাদৃত হয়েছিল।

হাদীস ও ইসলামী আইন শাস্ত্রে ইমাম শাফিঈ যে অবদান রেখে গেছেন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিশ্বের নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লাখ লাখ শাফিঈ মাযহাবের অনুসারীরা। ইসলামী আইন শাস্ত্রের আকাশে তাঁর পদচারণা এতটা দাপটের যে, যার আভা উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় আলোকিত করে সারা বিশ্বকে সম্মোহিত করেছে।

৮.৩ শাফিঈ মাযহাবের বৈশিষ্ট্য

১. আইন নির্ণয়ে কুরআনকে সর্বাগ্রে গ্রহণ।

২. কুরআন-হাদীসের প্রকাশ্য অর্থের প্রয়োগে বিশ্বাসী ছিলেন।

৩. দ্বিতীয় পর্যায়ে হাদীসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করতেন।

৪. হাদীসকে দলিল হিসেবে ব্যবহার করার ব্যাপারে কোন শর্তারোপ করেননি।

৫. হাদীসের পর ইজমা গ্রহণ করতেন।

৬. ইস্তিহ্সান ও ইসতিসলাহ মানেননি বরং ইস্তিদলাল পদ্ধতি গ্রহণ করে ফিকহ রচনা করেছেন।

৭. কিয়াসকে আনুপাতিক হারে কম গ্রহণ করতেন।

ইসলামী চিন্তাজগতে ইমাম শাফিঈ এক বিস্ময়কর প্রতিভা। মুসলিম বিশ্বে তাঁর চিন্তা দারুণভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তিনি স্বীয় প্রতিভাদীপ্ত ইজতিহাদী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অমর হয়ে আছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৭.৮

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করুন–

১. ইমাম শাফিঈ (র) পূর্ণ নাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইদরীস।

২. ইমাম শাফিঈ ইসরাঈল কর্তৃক দখলীকৃত ফিলিস্তিনের গাজা ভূ-খণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন।

৩. ইমাম শাফিঈ (র) মদীনায় লালিত-পালিত হন।

৪. ইমাম শাফিঈ (র) মাত্র দশ বছর বয়সে পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করেছিলেন।

৫. ইমাম শাফিঈ (র) কে ফিকহ শাস্ত্রে সর্বপ্রথম কিয়াসের ব্যবহারকারী বলা হয়।

৬. ইমাম শাফিঈ (র) ইমাম আবূ হানিফার (র) শিষ্য ছিলেন।

৭. ইমাম শাফিঈ (র) কে 'উসূলুল ফিকহ-এর প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইমাম শাফিঈ (র) পরিচয় ও প্রাথমিক জীবন লিখুন।

২. ফিকহ শাস্ত্রে ইমাম শাফিঈ (র)-এর অবদান মূল্যায়ন করুন।

৩. শাফিঈ (র) মাযহাবের বৈশিষ্ট্য লিখুন।

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) ও তাঁর মাযহাব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- ইমাম আহমদের পরিচয় ও জীবনী উল্লেখ করতে পারবেন;
- ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের অবদান বর্ণনা করতে পারবেন;
- হাম্বলী মাযহাবের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন।

৯.১ জীবনী ও কর্ম

ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রের চতুর্থ মাযহাবের ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ)। তিনি হিজরি ১৬৪ মোতাবেক ৭৮০ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইবন হাম্বল নামে সুপরিচিত। তৎকালীন অনেক অভিজ্ঞ আলিমের নিকট থেকে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল হাদিস শাস্ত্রের সমর্থক ছিলেন। তিনি হাদিসের ওপর বিস্তৃত গবেষণা করেন। হাদিসের ওপর তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে 'মুসনাদ'। এতে প্রায় ত্রিশ হাজার হাদিস আছে। পুরোপুরি হাদিসের উপর নির্ভর করতেন বলে তিনি ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগের প্রতি তেমন জোর দিতেন না।

তিনি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত যুক্তি কম প্রয়োগ করতেন। দুর্বলতম হাদিসকেও তিনি উপেক্ষা করেননি। কোন আকস্মিক ব্যাপার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উৎস সন্ধান যখন সম্ভব হত না, কেবল তখনই তিনি যুক্তি প্রয়োগের সাহায্য গ্রহণ করতেন। হাদিসের ওপর নির্ভর করা এবং যুক্তি প্রয়োগের পক্ষপাতি না হওয়ায় তাঁর মাযহাব অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টসাধ্য ছিল। একথা সুস্পষ্ট যে, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র)-এর মাযহাবে যুক্তির প্রয়োগ যথাসম্ভব কম ছিল। এর ফলে তিনি চার ইমামের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম আযম আবু হানিফা (র)-এর উচ্চাদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন। ইমাম আবু হানিফা (র) অবাধে যুক্তি প্রয়োগ করতেন। আল-কুরআনের আলোকে যুক্তির সাহায্যে যে কোন প্রশ্নের মীমাংসায় পৌঁছবার চেষ্টা করতেন।

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) একজন রক্ষণশীল মুসলমান ছিলেন। মুতাযিলা মতবাদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করায় মুতাযিলা মতবাদের পৃষ্ঠপোষক খলিফা মুন্তাসিম তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু মুতাওয়াক্কিল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তাঁকে কারামুক্ত করেন। ৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি বাগদাদে ইনতিকাল করেন। আইন প্রণয়নের ব্যাপারে কড়াকড়ি নীতি অনুসরণের জন্য হাম্বলী মাযহাবের তেমন প্রসার হয়নি। তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা মাত্র ৩০ লক্ষ।

ঐতিহাসিক ইবন খাল্লিকান-এর মতে, আহমদ ইবন হাম্বলের (র) জানাযায় প্রায় আট লক্ষ পুরুষ ও ষাট হাজার মহিলা উপস্থিত হয়েছিলেন। জানাযাতে এই বিরাট সমাবেশ তাঁর জনপ্রিয়তার কথাই প্রমাণিত করে। আরও কথিত আছে যে, তাঁর মৃত্যুর দিন কমপক্ষে বিশ হাজার খ্রিষ্টান, ইয়াহুদি ও পারসিক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

৯.২ হাম্বলী মাযহাবের বৈশিষ্ট্য

১. ইমাম আহমদের ফিক্‌হে কুরআন ও হাদীসের বাহ্যিক প্রতিফলন ঘটেছে।

২. তিনি হাদীসে মারফূ ও মাওকুফকে সমমর্যাদা দিয়ে ফিক্‌হ রচনা করেছেন।

৩. যথাসম্ভব তিনি কিয়াস বর্জন করেছেন।

৪. তাঁর ফিক্‌হ খুবই সহজ ও সরল।

৫. বুদ্ধি ও যুক্তিতর্কের স্থান তাঁর মাযহাবে অতি কম ছিল।

শতাব্দীর গুলিস্তানে যারা ক্ষণিকের পু□*রাজ হয়ে আগমন করেন, ইমাম আহমদ (র) ছিলেন তেমনি ব্যক্তিত্ব। তাঁর* চিন্তাধারা ও দর্শন মুসলিম বিশ্বে সমাদৃত হয়। তিনি নিজ কর্মের মাঝে চির অম্লান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৭.৯

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি বলুন-

১. ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রে চতুর্থ ইমাম-

ক. ইমাম বুখারী
খ. ইমাম আবু হানিফা
গ. ইমাম শাফিঈ
ঘ. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল

২. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল কোন নামে বেশি পরিচিত ছিলেন?

ক. ইমাম
খ. ইবন হাম্বল
গ. ইমাম দারুল হিজরাত
ঘ. ইমাম আহমদ

৩. আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত যুক্তি কম প্রয়োগ করতেন কোন ইমাম?

ক. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল
খ. ইমাম মালিক ইবন আনাস
গ. ইমাম নুমান ইবন সাবিত
ঘ. ইমাম বুখারী

৪. হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীর সংখ্যা কত?

ক. ৩০ কোটি
খ. ৩০ লক্ষ
গ. ৩০ হাজার
ঘ. ৩০০ জন

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইমাম আহমদ হাম্বলের জীবনী ও কর্মের বিবরণ দিন।

২. হাম্বলী মাযহাবের বৈশিষ্ট্য লিখুন।

ফিকহ্ শাস্ত্রে ব্যবহৃত কতিপয় পরিভাষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- ফিকহ্ শাস্ত্রে ব্যবহৃত পরিভাষার সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- ফিকহ্ শাস্ত্রে ব্যবহৃত পরিভাষাসমূহের সাথে পরিচিত হতে পারবেন।

ফিক্হ

ফিক্হ্ শব্দের অর্থ সূক্ষ্মদর্শিতা, গভীরজ্ঞান, শরীআতের অভিজ্ঞান। "যে শাস্ত্রে শরীআতের বিধি-বিধান সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় বিস্তারিত প্রমাণাদি থাকে তাকে ইলমে ফিকহ্ বলে।" অর্থাৎ শরীআতের প্রামাণ্য দলিলসমূহের ভিত্তিতে বাস্তব কাজ-কর্ম সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পর্কিত জ্ঞানই হল ফিকহ্।

শরীআত

শরীআত বলতে বুঝায়- "এমন এক সুদৃঢ় সোজাপথ, যার দ্বারা তার অবলম্বনকারী ব্যক্তিগণ হিদায়াত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মপন্থা লাভ করতে পারেন।"

ফিকহ শাস্ত্রে ব্যবহৃত আহকাম

ইসলামী শরীআতের বিধান মতে মানুষের কাজগুলোকে দু ভাগে ভাগ করা যায়–

(১) মাশরু (শরীআতসম্মত)

(২) গাইরে মাশরু (শরীআত পরিপন্থী)।

শরীআতসম্মত কার্যাবলিকে ছয় শ্রেণীতে ভাগ করা হয় :

ক. ফরয

ফরয অর্থ-অবশ্য পালনীয়। এটি মহান আল্লাহ তা'আলার অলঙ্ঘনীয় আদেশ, যা দলিলে কাতঈ বা অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলা সকল মুসলমানের ওপর তা অপরিহার্য ও অবশ্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছেন। এর অস্বীকারকারী কাফির বলে পরিগণিত হবে। এর পরিত্যাগকারীর জন্য কঠিন শাস্তির বিধান রয়েছে।

ফরয দু প্রকার : যথা- (১) ফরযে আইন ও (২) ফরযে কিফায়া।

(১) ফরযে আইন

যা প্রত্যেকের ওপর ফরয, প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবেই পালন করতে হয়। এ ধরনের ফরয কাজ এককভাবে অথবা সমষ্টিগতভাবে আদায় করতে হয়। যেমন- সালাত ও সাওম ইত্যাদি। এজন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকতে হয়।

(২) ফরযে কিফায়া

যা সমাজের প্রত্যেকের ওপর ফরয। তবে সমাজের কিছু লোক তা আদায় করলে সকলের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যায়। কিন্তু যদি কেউ আদায় না করে, তবে সমাজের সকলেই এর জন্য গুনাহগার হবে। যেমন- জিহাদ, জানাযার সালাত ইত্যাদি।

খ. ওয়াজিব

হাদীস দ্বারা যে সব অবশ্য পালনীয় সাব্যস্ত হয়েছে তাকে ওয়াজিব বলে। ওয়াজিবও ফরযের ন্যায় অবশ্যই পালনীয়। তবে গুরুত্বের দিক থেকে ফরযের পরে এর স্থান। ওয়াজিব অস্বীকার করলে কাফির হয় না। বিনা কারণে তা ত্যাগ করলে ফাসিক হবে এবং কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধী বলে পরিগণিত হবে।

গ. সুন্নাত

ফরয এবং ওয়াজিব ছাড়া শরীআতের যে সকল কাজ নবী করীম (স) নিজে করেছেন এবং যা করার নির্দেশ প্রদান করেছেন বা অনুমোদন করেছেন তাকে সুন্নাত বলা হয়। এছাড়াও খুলাফায়ে রাশেদীন শরীআতের যে সকল কাজ প্রবর্তন করেছেন সেগুলোকেও মহানবী (স)-এর সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তা অনুসরণ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। যেমন, হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهدِيْن

অর্থ : "তোমাদের ওপর অবশ্য কর্তব্য-আমার সুন্নাত এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের অনুসরণ করা।"

সুন্নাত দু প্রকার। যথা-
(১) সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা ও (২) সুন্নাতে গাইরে-মুওয়াক্কাদা বা সুন্নাতে যায়িদাহ।

ঘ. মুস্তাহাব

নবী করীম (স) যে সব কাজ কখনো কখনো অন্যদেরকে করার জন্য উৎসাহিত করেছেন তাকে মুস্তাহাব বলা হয়। মুস্তাহাব কাজ আদায় করলে সাওয়াব হয়। তবে না করলে কোন গুনাহ হয় না। পরিভাষায় মুস্তাহাবকে 'নফল' ও মানদুব বলা হয়ে থাকে।

ঙ. মুস্তাহসান

যে সব কাজ উলামা মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখ্খিরীন (পূর্ববর্তী ও পরবর্তী শরীআত বিশেষজ্ঞগণ) আল-কুরআন, হাদীস ও সুন্নাতের আলোকে ভাল বলে গ্রহণ করেছেন, তাকে মুস্তাহসান বলা হয়। মুস্তাহসান পালনে সাওয়াব আছে, তবে বাদ দিলে গুনাহ হয় না।

চ. মুবাহ

যে কাজ করাতে কোন সাওয়াব নেই এবং না করাতে কোন গুনাহ নেই, শরীআতের পরিভাষায় সেসব কাজকে মুবাহ বলা হয়। ইচ্ছা করলে তা করতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে তা নাও করতে পারে।

হালাল

শরীআতের দৃষ্টিকোণ থেকে যে সকল বস্তু ব্যবহার করা বৈধ তাকে হালাল বলা হয়।

মাকরূহ তাহরীমী

যে সকল কাজ নিষিদ্ধ হওয়া অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত নয়। বিনা কারণে এ সব কাজ করা গুণাহ ও শাস্তি যোগ্য অপরাধ।

মাকরূহ তানযীহ

যে সকল কাজ পরিত্যাগ করাতে সাওয়াব লাভ হয় না এবং করলে গুনাহগার হয় না। তবে শরীআতের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় এরূপ কাজ মাকরূহে তানযীহ।

হারাম

যে সকল কাজ নিষিদ্ধ হওয়া অকাট্য দলিল দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত তাকে হারাম বলা হয়। বিনা কারণে যে এমন কাজ করে সে ফাসিক। তার জন্য কঠিন আযাব নির্ধারিত। হারামের অস্বীকারকারী কাফির হয়ে যায়। ফরয এবং হারাম প্রমাণের বিষয়টি একই পর্যায়ের। ফরয কাজ করা ফরয আর হারাম কাজ বর্জন করাও ফরয।

মুফতী

যিনি ফাতাওয়া দান করেন। যে ফিকহতত্ত্ববিদ বিভিন্ন ঘটনা ও বিভিন্ন সমস্যা সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দান করেন তাকে মুফতী বলা হয়। মুফতীর জন্য উসুলে শরীআত হতে মাসআলা উদ্ভাবনের যোগ্যতা থাকা অবশ্যই প্রয়োজনীয়।

আল্লামা শামী (র) বলেন, মুফতীই মুজতাহিদ। যে ব্যক্তি মুজতাহিদ নন সে ব্যক্তি মুফতী হতে পারেন না। এমন ব্যক্তির নিকট যখন কোন প্রশ্ন করা হয়, তখন তার উচিত তার ঐ কথাটি কোন মুজতাহিদের উক্তি তা উল্লেখ করা। এমন ব্যক্তি মূলত ফাতাওয়া নকলকারী হিসেবে গণ্য হন।

আল ইমামুল-আযম : (বড় ইমাম)

হানাফী ফিকহের কিতাবে 'আল-ইমাম' কিংবা আল-ইমামুল আযম শব্দের প্রয়োগ হলে এর মাধ্যমে হানাফী মাযহাবের ইমাম আবু হানিফা (র) কে বুঝানো হয়ে থাকে।

রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের ক্ষেত্রে দ্বীনী ও দুনিয়াবী সকল বিষয়ে যাঁর সঠিক কর্তৃত্ব থাকে, তাঁকেও ইমাম বলা হয়ে থাকে।

ইমামতে কুবরা

যাঁরা দ্বীনী আকীদা ও বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করেন, এ ধরনের ইমাম মুজতাহিদকে কুবরা বলে। এভাবে সালাতের জামাআতে যাঁর ইক্তিদা করা হয়, তাঁকেও ইমাম বলা হয়। এটি হল ইমামতে সুগ্‌রা।

সাহিবাইন, শায়খাইন, তারফাইন

হানাফী মাযহাবে সাহিবাইন শব্দ দ্বারা ইমাম আবু হানিফা (র)-এর শিষ্যদ্বয়-ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) কে একসঙ্গে বুঝানো হয়। অনুরূপভাবে শায়খাইন শব্দ দ্বারা স্বয়ং ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ (র) কে একত্রে বুঝানো হয়ে থাকে। তারফাইন শব্দের মাধ্যমে একত্রে ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর অন্যতম শিষ্য ইমাম মুহাম্মদ (র)-কে বুঝানো হয়ে থাকে।

আল-ইমামুস-সানী

হানাফী মাযহাবে আল-ইমামুস্ সানী বলতে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-কে বুঝানো হয়ে থাকে।

আল ইমামুর-রাব্বানী

হানাফী মাযহাবে আল-ইমামুর-রাব্বানী বলতে ইমাম মুহাম্মদ (র) কে বুঝানো হয়ে থাকে।

আয়িম্মায়ে ছালাছা ও আয়িম্মায়ে আরবাআহ

হানাফী মাযহাবে "আয়িম্মায়ে ছালাছা" বলতে তিন ইমাম অর্থাৎ হযরত আবু হানীফা (র), ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) কে বলা হয়। আর সাধারণভাবে ইমাম আযম আবু হানীফা ছাড়া ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমদ (র) কে বুঝানো হয়।

আয়িম্মায়ে আরবাআ

ফিকহর কিতাবে আয়িম্মায়ে আরবাআ বলতে চার ইমামকে বুঝানো হয়। ইমাম চার জন হলেন– ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফিঈ, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র)।

শামসুল আয়িম্মা

আমাদের হানাফী মাযহাবের কিতাবে শামসুল আয়িম্মা বলতে ইমাম সারাখসী (র) কে বুঝানো হয়ে থাকে।

মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখ্‌খিরীন

ফিকহের কিতাবে মুতাকাদ্দিমীন অর্থাৎ পূর্ব কালের উলামা বলতে সাধারণত তাঁদেরকে বুঝানো হয়ে থাকে, যাঁরা তিন ইমাম অর্থাৎ, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছেন। আর তাঁদের পরবর্তীগণকে মুতাআখখিরীন অর্থাৎ, পরবর্তী কালের উলামা বলা হয়।

সালাফ ও খালাফ

যে ইমামের মাযহাবের মতের অনুসরণ করা হয়, তাকে সালাফ বলা হয়। যেমন– ইমাম আবু হানিফা (র), অন্যান্য ইমাম ও তাঁদের সহচরবৃন্দ। তাঁরা আমাদের সালাফ যেমন সাহাবায় কিরাম ও তাবঈন ছিলেন তাঁদের সালাফ। তাঁদের পরবর্তীগণকে 'খালাফ বলা হয়। কখনো কখনো সালাফ শব্দটি দিয়ে সাহাবা, তাবঈন ও তৎপরবর্তী চতুর্থ শতক পর্যন্ত উলামায়ে কিরামকে আখ্যায়িত করা হয়। আর চতুর্থ হিজরী শতকের পরবর্তীদেরকে বলা হয় খালাফ।

ইস্‌তিহ্‌সান

ইসতিহসান শব্দের অর্থ কোন কিছুকে ভাল মনে করা। পরিভাষায় ইস্‌তিহসান শব্দটি এমন দলিলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, যা কিয়াসে জলীর মোকাবিলায় আসে।

ইজতিহাদ ও মুজতাহিদ

ইজতিহাদ শব্দের অর্থ চেষ্টা সাধনা করা। পরিভাষায় কোন ফকীহ আলিমের কোন শরয়ী হুকুম সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভের নিমিত্তে চিন্তা ও গবেষণা করাকে ইজতিহাদ বলা হয়। শরয়ী হুকুম গবেষণাকারীকে বলা হয় মুজতাহিদ।

আল মাযাহিবুল আরবাআ

প্রসিদ্ধ ফিকহী চার মাযহাবকে এক সাথে মাযাহিবুল আরবাআ বলা হয়ে থাকে। মাযহাব চারটি হল–হানাফী, শাফিঈ, মালিকী ও হাম্বলী।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৭.১০

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

এক কথায় উত্তর দিন-

১. ফিক্হ কাকে বলে?
২. শরীআত কী?
৩. গাইরে মাশরু বলতে কি বুঝায়?
৪. ফরয মানে কী?
৫. ফরয কয় প্রকার ও কী কী?
৬. ওয়াজিব মানে কী?
৭. সুন্নাত মানে কী?
৮. সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদাহ কী?
৯. মুস্তাহসান মানে কী?
১০. মুবাহ কী?
১১. মুফতী কাকে বলে?
১২. আল-ইমামুল আযম অর্থ কি এবং কে?
১৩. সাহিবাইন কারা?
১৪. তারফাইন কারা?
১৫. আয়িম্মায়ে আরবাআ কারা?
১৬. মুতাকাদ্দিমীন অর্থ কী?
১৭. মুতাআখখীরীন মানে বলুন।
১৮. ইস্তিহসান মানে কী?
১৯. ইজতিহাদ কী?
২০. "আনামাযাহিবুল" বলতে কী বুঝায়?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. নিচের ৫টি বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।
শরীআত, ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, মুবাহ, হালাল-হারাম, মুফতী, ইজমা, কিয়াস, ইস্তিহসান, মুজতাহিদ।

চূড়ান্ত মূল্যায়নঃ ৭

বিশদ উত্তর মূলক প্রশ্ন

১. ইজমা কাকে বলে? ইজমা শরীআতের উৎস তা প্রমাণ করে ইজমার উৎপত্তির কারণ লিখুন।
২. ইজমা কাকে বলে? ইজমার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা লিপিবদ্ধ করুন।
৩. ইজমা কী? ইজমা কত প্রকার? ইজমা অনুষ্ঠানের পদ্ধতি, হুকুম ও কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করুন।
৪. কিয়াস কী? কিয়াসের প্রয়োজনীয়তা লিখুন।
৫. কিয়াস কাকে বলে? কিয়াসের উৎপত্তির কারণ কী? কিয়াসের নীতিমালা ব্যাখ্যা করুন।
৬. ফিকহ শাস্ত্রের পরিচয় ও এর উৎপত্তির কারণ বিশ্লেষণ করুন।
৭. ফিক্হ কী? ফিকহ শাস্ত্রের উৎস কী কী এবং ফিকহ শাস্ত্রের বিষয়বস্তু লিখুন।
৮. ফিক্হ শাস্ত্র সংকলনের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করুন।
৯. মাযহাব মানে কী? মাযহাবের পার্থক্যের কারণ বিশ্লেষণ করে প্রধান মাযহাবগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরুন।
১০. ইমাম আবু হানীফা (র) জীবন ও অবদান বিশ্লেষণ করুন।
১১. হানাফী মাযহাবের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহের তালিকা প্রস্তুত করুন।
১২. ইমাম মালিক (র)-এর জীবনী লিখে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মালিকী মাযহাবের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
১৩. ইমাম শাফিঈ (র) পরিচয় ও সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখে তাঁর প্রবর্তিত শাফিঈ মাযহাবের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরুন।
১৪. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত উল্লেখ করে তাঁর মাযহাবের বৈশিষ্ট্য লিখুন।
১৫. ফিকহ শাস্ত্রে ব্যবহৃত প্রসিদ্ধ পরিভাষার অর্থসহ একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।